বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজ

বলদর্পি হিটলার, দৌলতখানা, কম্যাণ্ডার কবুতর, সত্যাশ্রয়ী বাপুজি, সয়তানের ঘাঁটী, B. L. A. ২০৫, বিদ্রোহী, কুশধ্বজ প্রণেতা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দাম এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩এ, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা

সূচী

ভূমিকা

বহুদিন যাবৎ অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করা শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমার এক মহান্ কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই কর্ত্তব্য—বোধ সজাগ হইয়া ওঠে আরও অনেক দিন পরে। শান্তি-নিকেতনের অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র, আমার সোদরোপম ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনোরঞ্জন চৌধুরীর মৃদু তিরস্কার ও উৎসাহ-বাণীই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, আজ আর সে জীবিত নাই।

মনোরঞ্জন নিজেও ছিল সুসাহিত্যিক। ঢাকা হইতে প্রকাশিত তাহার সম্পাদিত 'দীপিকা' মাসিক পত্রিকা এককালে যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সে সৌভাগ্য মফঃস্বলে অতি কম কাগজেরই হইয়াছে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নিজে সুসাহিত্যিক হইলেও তাহার চরিত্র-মাধুর্য্য ও স্নেহশীল হৃদয়ের জন্য সে তাহার এই অযোগ্য বন্ধুকেই যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিয়া মনে করিয়াছিল! সেইজন্য গুরুদেবের জীবনী-আলোচনা সে নিজে না করিয়া আমাকেই তাহাতে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে! আজ আমার সেই বিশ্বাসী বন্ধুটি নাই; তাহারই ন্যস্ত কাজ তাহার বন্ধু যে কি ভাবে সম্পন্ন করিল, কে তাহার বিচার করিবে? একদিন মনোরঞ্জনের প্রেরণাই আমাকে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে উৎসহিত করিয়াছিল, আজ তাহার মৃত্যুর পরেও আমি মুক্তকণ্ঠে আমার সেই ঋণ স্বীকার করিতেছি।

পরিশেষে আরও একটি ঋণ স্বীকার না করিলে পরম অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। এই পুস্তক রচনায় প্রেরণা দিয়াছিল বন্ধু মনোরঞ্জন, কিন্তু উপকরণ সংগ্রহের জন্য বহুগ্রন্থের সাহায্য দানে আমাকে উপকৃত করিয়াছেন কল্যাণীয়া বিদুষী কুমারী কবি উমা দেবী, এম্ এ. তাঁহার সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ প্রণয়ন আমার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য হইত। আমি তাঁহারও নিকট আমার দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-বন্ধন স্বীকার করিয়া বিদায় লইতেছি।

১১নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট্
কলিকাতা,
১লা আষাঢ় ১৩৫৫

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপহার

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

শ্রীশ্রীচরণেষু—

জীবন-প্রভাতে যাঁকে একদিন শান্তি-নিকেতনে অশান্তির জ্বালায় উৎপীড়ন করে এসেছিলাম, জীবন-সায়াহ্নে আজ তাঁরই চরণে এই ক্ষুদ্র গুরু-দক্ষিণা।

কলিকাতা
১১নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
১লা আষাঢ়, ১৩৫৫

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ

জন্ম—২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল

মৃত্যু—২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল

গুরুদেব

এক

সূচনা

এক সুন্দর সুকুমার বালক "বর্ণ-পরিচয়" প্রথম ভাগের পাতা খুলিয়া পড়িতেছিল।

প্রাণে তাহার সেদিন কত উৎসাহ! "কর খল" প্রভৃতি অকারান্ত বানান সে শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। একটা প্রচণ্ড তুফান কাটাইয়া সে যেন সবেমাত্র কূল পাইয়াছে! আজ সে নূতন পড়া পড়িবে।

শিক্ষক তাহাকে পড়াইলেন, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" বালকও পড়িল, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" শিক্ষক আবার তাহা পড়াইলেন, বালকও তাঁহার অনুকরণ করিল। এইভাবে কয়েকবার অভ্যাস হইয়া গেলে বালক একাই পড়িতে লাগিল, "জল পড়ে পাতা নড়ে।"

"জল পড়ে পাতা নড়ে", "জল পড়ে পাতা নড়ে," পড়িতে পড়িতে বালকের কানে যেন কিসের এক ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল—মিলের গন্ধে আর সুরের ছন্দে সে যেন আত্মহারা উন্মনা হইয়া গেল।

বালকের আনমনা ভাব দেখিয়া শিক্ষক বিরক্ত হইলেন, তাহাকে তিরস্কার করিলেন, বালককে তিনি কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব কি হচ্ছে? পড়তে পড়তে থেমে যাচ্ছ কেন? মন যাচ্ছে কোথায়?"

তাই ত' কোথায় বালকের মন? সে যে নিজেও তাহা জানে না!

কিসের আকর্ষণে বা কোন্ রাগিণীর কিসের মূর্চ্ছনায় সে এমন অভিভূত হইয়া গেল ?

"জল পড়ে পাতা নড়ে," সামান্য দুটি কথা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডেই সে কথা ফুরাইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার ঝঙ্কার ত' ফুরায় না। কান ও মনের মধ্যে মিলটাকে লইয়া যেন লোফালুফি খেলা চলিতে থাকে!

বালক সেদিন তাহার এই অপূর্ব্ব অনুভূতির কথা শিক্ষককে খুলিয়া বলিতে পারে নাই। কাজেই সে নীরবে শিক্ষকের তিরস্কার হজম করিয়া গেল! কিন্তু বড় হইয়া সেই বালকই পৃথিবীতে ঘোষণা করিয়াছে—

> "ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"*

"চৈতন্যের মধ্যে জল পড়া ও পাতা নড়া" এক রহস্যময় উক্তি সন্দেহ নাই। বালকের শিক্ষকও সেদিন একথা শুনিলে হয়তো স্তব্ধ বিস্ময়ে বালকের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন। কিন্তু বালক সেদিন তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই, প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। একটা অব্যক্ত কৌতুক ও চঞ্চল প্রাণের সজীব নর্ত্তন তাহার হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে সুর-লয়-তান সংযোগে এক ঝঙ্কার তুলিয়া ফিরিতেছিল। আর সামান্য কথা দুটির মিল ও ছন্দ তাহার বুকের দুয়ারে কোন্ এক মহা সম্ভাবনার ইঙ্গিত জানাইতেছিল।

* জীবন-স্মৃতি।

আজ বঙ্গদেশ জানে, ভারতবর্ষ জানে, সমগ্র পৃথিবী জানে—ভবিতব্যের সেই ইঙ্গিত বালকের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বালকই উত্তর কালে মিল ও ছন্দের সাধক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত হইয়া পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বিকশিত জীবনে যিনি কাব্য-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া গৌরবের অধিকারী হইবেন, সামান্য দু'টি কথার ছন্দ ও সুর বুঝি তাঁহাকে এমনই ভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকে! আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকিও সামান্য একটি ঘটনায় তাঁহার ব্যথিত মর্ম্মস্থলের অন্তস্তল হইতে যে ব্যথা উৎসারিত করিয়াছিলেন, তাহাই শ্লোকের মূর্চ্ছনায় জগতের সর্ব্বপ্রথম 'কবিতা' বা 'পদ্য'।

দেখা গেল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ণ-পরিচয়, প্রথম ভাগের "জল পড়ে পাতা নড়ে," এই গুটি-কয়েক শব্দই তাঁহার কানে কবিতার ঝঙ্কার হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আর সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার জীবনকে কাব্য-কাননে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় ও তিনি কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সেদিনের সেই স্মৃতিটুকুর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে বলিয়াছেন—

> "আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ

হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না।”

মহান্ অমরত্বের ঐশ্বর্য্য লইয়া যুগে যুগে যাঁহারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশের কাছেই অতি সামান্য দু'টি কথা কিংবা সামান্য একটি ঘটনা, এক বিরাট সম্ভাবনা লইয়া ধরা দিয়াছে !

দুই

পরিচয়

বাংলার এক গৃহ-কোণে, এই ভাবে যে শিশুটি একদিন পরম বিস্ময়ে, মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে উৎকর্ণ হইয়া বাণী দেবীর কোন্ ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই শিশু রবীন্দ্রনাথের পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী।

ইংরেজী ১৮৬১ সালের ৭ই মে, মঙ্গলবার, বঙ্গাব্দ ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, এক শুভ মুহূর্ত্তে, কলিকাতায় ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে, পৈতৃক গৃহে শিশু রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

মহর্ষির পনেরোটি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্ব-কনিষ্ঠ মহর্ষির পিতার নাম দ্বারকানাথ। তাঁহাদের আদি নিবাস 'পিরালা'-নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম। পিরালার ব্রাহ্মণ-বংশ বলিয়া তাঁহারা 'পিরালী ঠাকুর' নামে পরিচিত ছিলেন। সেকালে 'ঠাকুর' শব্দটি সম্মান জনক অর্থেই ব্যবহৃত হইত।

এই পিরালী ঠাকুর-বংশ কৃষ্ণনগরে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। দ্বারকানাথের প্রপিতামহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধনীর পর্য্যায়ে উন্নীত হন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বহু পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্মীর কৃপায় গরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বারকানাথের কৃতিত্বে ধনীর খ্যাতি আরও বেশী বিস্তৃত হইয়া

পড়ে এবং অবশেষে তাঁহার অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার জন্য তিনি 'রাজা দ্বারকানাথ' (Prince দ্বারকানাথ) নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ।

দ্বারকানাথের সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও রামমোহন রায় উদার ভাবাপন্ন ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামি ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করিয়া এক নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন ; সেই ধর্ম্মের নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম। রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে দ্বারকানাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

কেবল গ্রহণ করাই নহে, বলিতে গেলে দ্বারকানাথ তাঁহার ঐকান্তিক সাহায্যে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে সতীদাহ-প্রথা নিবারণের জন্য লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, রাজা রামমোহন ও দ্বারকানাথ তাহাতেও কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারাই পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া হিন্দু সমাজের এই নৃশংস প্রথার প্রতি বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

দ্বারকানাথ দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যে অসাধারণ ছিলেন। সে যুগে বিলাত-ভ্রমণ অনেকটা নিষিদ্ধ থাকিলেও দ্বারকানাথ সেরূপ কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলিতেন। সুতরাং তিনি স্বয়ং লণ্ডনে যাইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যের জন্য তিনি লণ্ডনের আপামর জনসাধারণের মনোযোগ

আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এমন কি, মহারাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রীতি-ভোজে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

তিনি বিলাতে গমন করিয়াছিলেন দুইবার। দ্বিতীয়বার বিলাত-ভ্রমণের সময় তিনি মেডিক্যাল কলেজের চারিটি ছাত্রকে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষিত করিবার উপযোগী সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের জীবনে তাঁহার এইরূপ সদ্ব্যয় ছিল অজস্র। তৎকালে এমন কোন জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহাতে দ্বারকানাথ কোন না কোন ভাবে জড়িত ছিলেন না। তাঁহার অপরিমিত দান ও অসাধারণ বিলাসিতার জন্য তিনি অতি যোগ্য ভাবেই 'প্রিন্স' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণই শেষ ভ্রমণ হইয়াছিল। তিনি তাহার পরে আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে সেখানেই তিনি পরলোক গমন করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারক-রূপে জগতে তিনিও অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠপোষক-রূপে ধর্ম্ম-জগতে অদ্যাপি তিনি সুপরিচিত।

তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ তদীয় জীবদ্দশায় দান ও বিলাসিতায় যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতে মৃত্যুকালে তাঁহার বহু লক্ষ টাকার ঋণ হইয়াছিল। উত্তমর্ণগণ তজ্জন্য দেবেন্দ্রনাথকে পুনঃ পুনঃ তাগিদ ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ

হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়গণ উত্তমর্ণদিগকে ফাঁকি দেওয়ার পরামর্শই দিয়াছিলেন। কার্য্যতঃ তাহা খুব অসম্ভবও হইত না; কারণ, দ্বারকানাথ অপরিমিত ঋণ করিলেও, তাহাদের অধিকাংশই এমন ভাবে বন্দোবস্ত করা ছিল যে, পাওনাদারগণ দ্বারকানাথের ত্যক্ত সম্পত্তি স্পর্শও করিতে পারিতেন না।

সাধারণ লোক হইলে হিতৈষী ব্যক্তিদিগের এই উপদেশই গ্রহণ করিত সন্দেহ নাই; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেই চরিত্রের লোক ছিলেন না। তিনি পিতার সমগ্র ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহাদিগকেই সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। পরিবারের মহিলাদিগের ব্যক্তিগত আভরণও তিনি তাঁহাদিগকে দিতে চাহিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই সৎসাহস ও সাধু-চরিত্র দেখিয়া উত্তমর্ণগণ মুগ্ধ হইলেন; তাঁহারা যুগপৎ সমগ্র টাকা দাবী না করিয়া ধীরে ধীরে আদায় করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং দ্বারকানাথের ত্যক্ত সম্পত্তির পরিচালনা-ভার দেবেন্দ্রনাথের হাতেই রাখিয়া দিলেন। মোট কথা, তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় সাধু-চরিত্র ব্যক্তি কখনও তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিবেন না।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আদর্শ ধর্ম্ম-জীবন ও এতাদৃশ সাধু-চরিত্রের জন্য 'মহর্ষি' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ জীবনে দিবানিশি কেবল ঈশ্বরোপাসনায়ই নিমগ্ন থাকিতেন। সাতাশি বৎসর বয়সে—পরিণত বয়সে, তিনি দেহত্যাগ করেন।

মহর্ষির সাহিত্যিক প্রতিভাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

কবিগুরুর পিতা ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

কবিগুরুর পত্নী ৺মৃণালিনী দেবী
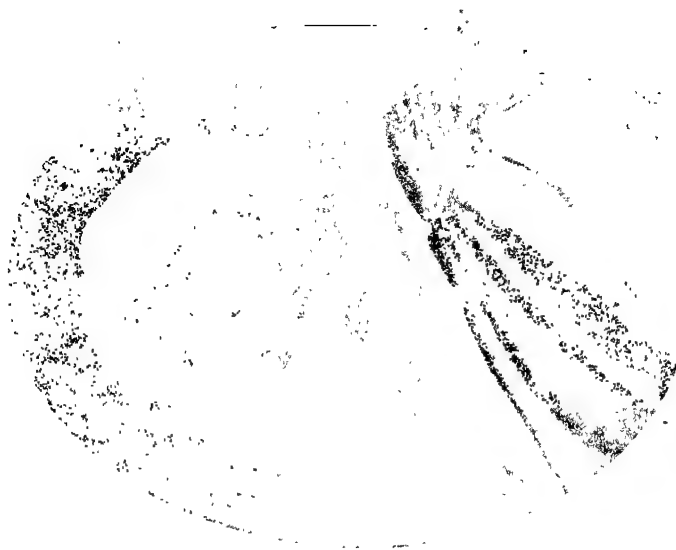
তাঁহার রচিত "আত্মজীবনী" পাঠ করিলে ইহা খুব ভালরূপেই উপলব্ধি হইবে।

কিন্তু মানুষ তাহার স্বরচিত জীবনীতে নিজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়া যায়, সেই মানুষটিকে বুঝিবার জন্য কেবল তাহাই যথেষ্ট নহে। অনেক কিছু কথাই লেখককে উহ্য রাখিতে হয়। মহর্ষির 'আত্মজীবনী' সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। সেই নিরীহ সাধু-প্রকৃতি ব্যক্তিটির হৃদয়ের অন্তস্তলে যে তেজস্বিতা ও স্বদেশ-প্রেম লুক্কায়িত ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে মহর্ষিকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সেই প্রাচীন যুগে ইংরেজই যখন বাংলার চোখে দেবতার আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, ইংরেজের স্তাবকতা, ইংরেজের পূজা যখন এদেশের অধিবাসীদের নিকট চতুর্ব্বর্গ ফল-লাভের এক অমোঘ উপায় বলিয়া প্রমাণিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে যুগের এক নিরীহ মানুষ—বিশেষতঃ বাংলার এক বিশিষ্ট জমিদার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একেবারেই ইংরেজের তোষামোদ করিতে জানিতেন না, একথা বলিলেও তাহা যেন আজ অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়! কিন্তু ইহা যথার্থই খাঁটি কথা।

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁহার এত বেশী শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল যে, যাহারা তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া বিজয়ী হইয়া বসিয়াছিল, তিনি সেই ইংরেজদিগকে অপাংক্তেয় ঘৃণার পাত্র বলিয়াই মনে করিতেন। এমন কি, তাহাদের প্রশংসা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হইত। কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন

প্রিন্সিপ্যাল লব্ সাহেব (Mr. Lobb) ইহা সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়াও রাজপুরুষদিগের কর্ণ-গোচর করিয়াছিলেন।*

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার পিতৃদেব সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধার সহিত বলিয়াছেন ঃ

> "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদিগের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্ব্বকনিষ্ঠ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক, পণ্ডিত ও অতি সাধু-চরিত্র ছিলেন। তাঁহার রচিত 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' ও 'নানা চিন্তা' সুচিন্তিত প্রবন্ধ পুস্তক। মহর্ষির অপর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সিভিলিয়ান। 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস', মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও 'বুদ্ধ-কথা' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও তাঁহার রচনা। সত্যেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিশিষ্ট নাট্যকার, গায়ক ও অনুবাদ-সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁহার রচিত "অশ্রুমতী," "সরোজিনী" ও "অলীক প্রকাশ" এক সময় নাট্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিল।

মানুষ হিসাবেও তিনি অতি সরল ও সাধু-প্রকৃতি ছিলেন।

* "The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans."

—রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত।

প্রথম জীবনে তিনি বিবিধ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার ন্যায় সরল-প্রকৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যবসায়ের ফল যাহা হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও তাহাই হইয়াছিল। তিনি প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। শেষ জীবনে তিনি কেবল সাহিত্য-সাধনায়ই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর-পরিবারের মহিলাগণও প্রতিভাশালিনী ছিলেন। সত্যেন্দ্র-নাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা এবং বিশিষ্ট রুচির জন্য অদ্যাপি বরেণ্য হইয়া আছেন। কোমল-মতি বালক-বালিকাদের জন্য তিনি "বালক" নামে এক মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী স্বামীর শিক্ষায় সঙ্গীত-পারদর্শিনী হইয়া ঠাকুর-পরিবারে এক স্বর্গীয় সুর-লহরীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার অসাধারণ সাহিত্য-প্রভায় অদ্যাপি সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী নামে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন—

> "ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।"

সুতরাং ভাগ্যদেবী রবীন্দ্রনাথকে এমন বংশে এবং এমন পরিবারেই লইয়া আসিয়াছিলেন, যে বংশ ও যে পরিবার সেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই চরিত্র-মাহাত্ম্য, সাহিত্য-সৃষ্টি, সঙ্গীত-শিল্প ও রুচি-বৈশিষ্ট্যের জন্য সারা বাংলায় আদর্শ-স্থানীয় ছিল ; অর্থাৎ ভারতীয় নবযুগের তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন

শৈশব জীবনের চতুষ্পার্শে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল এবং যে প্রাণবায়ু গ্রহণ করিয়া শিশু রবীন্দ্রনাথের জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাতে নবযুগের ভাবী সম্ভাবনা বিশেষ ভাবেই পরিপূর্ণ ছিল।*

কাজেই রবীন্দ্রনাথ যে উত্তরকালে গরীয়ান্ ও মহীয়ান্ রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

* "So that Rabindranath, from his earliest days, grew up in the one house where all the surging tides of Indian Renaissance might flow round his daily life, and filled the air he breathed with the exhilarartion of their fresh airs."

তিন

শৈশব

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর ছেলে।—

যে গৃহে একদিন প্রিন্স্ দ্বারকানাথ বাস করিতেন, 'জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ী' বলিতে তাহাই বুঝায়। আর সেই ঠাকুর-বাড়ীতে ও ঠাকুর-বংশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিল, প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র—সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ, মর্য্যাদায় ও বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বাংশে তাহারই উপযুক্ত হইবেন।

কিন্তু পাড়ার লোকেদের মনে জাগিল এক প্রকাণ্ড বিস্ময়! রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার শিশু-বয়সেই যেদিন তাহারা দেখিল, সেদিনই তাহাদের মনে এক পরম সন্দেহের উদয় হইল! তাহাদের মনে হইল, এ কি? এই কি ঠাকুর পরিবারের বংশধরের উপযুক্ত সাজসজ্জা?

প্রিন্স্ দ্বারকানাথ এত বড় ধনী ও বিলাসী ছিলেন—বিলাতের অভিজাত সমাজেও যিনি তাঁহার অকৃপণ বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধর রবীন্দ্রনাথের সাজসজ্জা এত সরল ও সাদাসিধে?

অতি সাধারণ কাপড়ের এক জামা, মোটা ধুতি ও পায়ে চটী। দারুণ শীত, তবু মোজার চিহ্নমাত্র নাই!

সেদিন রবীন্দ্রনাথের এই দীনতম পোষাক-পরিচ্ছদ পাড়ার

লোকের পক্ষে যতখানি বিস্ময় ছিল, আজ আমাদের পক্ষেও ততখানি অবিশ্বাস্য ইহাতে সন্দেহ নাই! তথাপি ইহা সত্য—কঠিন সত্য।

এ সম্পর্কে, পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতিতে' স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমাদের শিশুকালে ভোগ-বিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপর তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। আহারে আমাদের সৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়-চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে, এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পুর্ব্বে কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। তাতে কোনো দিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই।"

ধনীর সন্তান হইলেও শৈশবে ও বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের বেশ-ভূষা এই রকমই ছিল। গৃহে মর্য্যাদা-সম্পর্কেও কোন সম্ভ্রমই ছিল না। 'স্বাধীনতা'-নামক জিনিষটা একেবারেই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল—সমগ্র শৈশবটাই যেন তাঁহার "দাস-রাজত্বের" যুগ। ভৃত্যদের শাসনেই তাঁহাকে একটানা কয়েকটা বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বড় হইয়া এ বিষয়ে বলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাস-রাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি, তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই

দেখিতে পাই না। এই সকল রাজাদের পরিবর্ত্তন বারংবার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল তাতেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই —পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম সংসারের ধর্ম্মই এই—বড়ো যে সে মারে, ছোট যে সে মার খায়।"

রবীন্দ্রনাথের জননী সারদা দেবীর সন্তান-সংখ্যা ছিল প্রচুর। তত্নপরি বিরাট এক সংসার তাঁহাকে তত্ত্বাবধান করিতে হইত। সম্ভবতঃ, এই দুই কারণে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধান-ভার ভৃত্যদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ভৃত্যরা পূর্ণভাবেই সে দায়িত্ব বহন করিয়াছিল।

বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁহাকে ভৃত্যদের শাসন মানিয়া চলিতে হইত। বিন্দুমাত্র ত্রুটীর জন্য তাহাদের হাতে তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছে! নিতান্ত অসহ্য হইলে, মাঝে মাঝে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে ফল হইত বিপরীত! ভৃত্যের দল তখনই চারিদিক হইতে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিত; আসিয়াই দুই হাতে উঁচু করিয়া তাঁহাকে বিশাল এক জালার কাছে লইয়া যাইত এবং রুদ্র শাসনের চণ্ড-বুলি সুরু হইত, "চুপ্ কর্, তা না হইলে এখুনি এই জালার ভেতর বন্ধ করে রেখে দেবো।"

দমন-নীতির এরূপ হুম্‌কির পরে সাধ্য কি তিনি কাঁদেন! কাজেই চণ্ডনীতির প্রবর্ত্তনে, সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশ-স্বরূপ অশ্রুজল অর্দ্ধপথেই শুষ্ক হইয়া যাইত!

এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং তাঁহার 'জীবন-স্মৃতিতে' বলিয়াছেন—

"মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্ত্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুতঃ সেটা ভৃত্য-রাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন্। আমার বেশ মনে আছে, সেই সিডিশন্ সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য, রাখিবার বড়ো বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দেবার চেষ্টা করা হইত।"

ভৃত্য-রাজের পাল্লায় পড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে সে যুগে কেবল বাধা-নিষেধই সহ্য করিতে হইয়াছে। "এখানে যেতে নেই, ওখানে যেতে নেই," এই রকম শাসন-অনুশাসনের পরিপূর্ণ ফিরিস্তির সমষ্টিই ছিল রবীন্দ্রনাথের শৈশব জীবন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, 'গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ্।' "

ভৃত্যের এরূপ কড়া শাসন, ধনী কি দরিদ্র, সকলের কাছেই অসহ্য ও অশোভন মনে হইবে সন্দেহ নাই! কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তাহাই নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা যেখানে এত দুর্ল্লভ, সেখানে মুহূর্ত্তের চুরি-করা স্বাধীনতাও যে কত আনন্দের ও কত কামনার, তাহা একমাত্র ভুক্তভোগী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না।

কেবল দুপুর-বেলায়ই ভৃত্যদের শাসন কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া

রবীন্দ্রনাথ এই গৃহে জন্মলাভ করিয়া, এই গৃহেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন

পড়িত—সম্ভবতঃ নিজেদের আহার-ব্যবস্থা ও কর্ম্মক্লান্ত দেহের কিছু আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে।"

মুক্তির আনন্দ কেবল এই দুপুর-বেলায়ই তিনি উপভোগ করিয়াছেন। জানালার মধ্য দিয়া তিনি বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন—ঘাট-বাঁধানো পুকুর আর ঘাটের পূবধারে এক চীনা বটগাছ তাঁহার চোখে পড়িত। তাঁহার মনে হইত, ইহারাও যেন তাঁহারই ন্যায় বন্দী! সুতরাং বন্দী জীবনের সাথী বলিয়া ইহাদের সঙ্গে তাঁহার যেন কত নিবিড় সম্বন্ধ!

সে কথা মনে করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা হোথায় রবির ছটা
পুকুর-ধারে বট।
দশদিকেতে ছড়িয়ে শাখা
কঠিন বাহু আঁকা বাঁকা
স্তব্ধ যেন আছে আঁকা
শিরে আকাশ-পট।"

কখনও সেই বটগাছটিকেই সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছে
মাথায় লয়ে জট
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট?

কতই পাখি তোমার শাখে
বসে যে চলে গেছে
ছোটো ছেলেরে তাদেরি মতো
ভুলে কি যেতে আছে ?"

শেষ চারি পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথের অসহায় অবস্থা যেন রুদ্ধ আর্ত্তনাদে সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষায় মিনতির সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

বালক রবীন্দ্রনাথ—ধনীর দুলাল রবীন্দ্রনাথ, ভৃত্যের শাসনে স্বাধীনতার অপমানে সেদিন যে অনুভূতি লইয়া কাল কাটাইয়াছিলেন, মহামানবের ইতিহাসে আজও তাহা গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কঠোর শাসন ও পরাধীনতার মর্ম্মজ্বালা আর কেহ বোধ হয় এমন তীব্রভাবে কখনও অনুভব করে নাই !

দিন-রাতের মধ্যে একমাত্র দুপুর-বেলায় তিনি যখন স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন, কেবল তখনই তিনি নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়াছেন ! একটু বড় হইলে, বাধা-নিষেধের গণ্ডী এড়াইয়া খোলা ছাদের একটুখানি স্বাধীনতা অতি কৃপণ ভাবে ভোগ করিতে পারিলেও তিনি তাহা চরম আনন্দ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ।"

শিশু রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা ছিল এমনই অপমানিত ও অবনমিত ! কেবল তাহাই নহে, আহারেও রবীন্দ্রনাথের কোন রুচি-অরুচির প্রশ্ন ছিল না—কোন স্বাধীনতা ছিল না। আর কিছু না

হউক্; অন্ততঃ আহ্বারে স্বাধীনতা অনেকেরই থাকে। "এটা খাব," "ওটা খাব না," "ও জিনিষটা আর কিছু দাও,"—এমন আবদার কোন্ পরিবারে কোন্ ছেলের না থাকে? কিন্তু শিশু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভৃত্যদের কবলে পড়িয়া তাহাতেও ছিলেন নিতান্তই দুর্ভাগ্য!

ঠাকুর-পরিবারে ঈশ্বর নামে এক চাকর ছিল। প্রধানতঃ তাহার উপরেই ছিল রবীন্দ্রনাথের জলখাবারের ভার। সে যে-ভাবে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিত, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

ঈশ্বরের কিছু কিছু আফিম খাওয়ার অভ্যাস ছিল। আফিমখোর ব্যক্তিরা একটু দুধ না খাইয়া পারে না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বরাদ্দ দুধ প্রায়ই কম হইয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথ তাহার এই দুর্ব্বলতা বুঝিতেন। কাজেই মাঝে মাঝে তাহাকে খুশি করিবার জন্য তিনি দুধ খাইতে আপত্তি প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বরও তাঁহাকে আর কিছুমাত্র অনুরোধ না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন।

লুচি পরিবেষণের বেলায়ও সে এইরূপ ব্যবহারই করিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতিতে' এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> "প্রথমে দু-একখানি মাত্র লুচি সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। তারপর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কি না। আমি জানিতাম কোন্ উত্তরটি দিলে সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না।"

কাজেই বড় ঘরে, বড় লোকের ছেলে হইয়াও কবি রবীন্দ্রনাথকে শৈশবে স্বল্পাহারেই থাকিতে হইয়াছে! পরিণত বয়সে যাঁহার কিছুমাত্র অনুগ্রহের জন্য ধনি-দরিদ্র শত শত লোক অধীর আগ্রহে

ভিড় করিয়া থাকিত, শৈশবে তাঁহাকেই 'শ্যাম' বা 'ঈশ্বর' জাতীয় ভৃত্যদের অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে!

ইহা যদি ভাগ্যের পরিহাস না হয়, তাহা হইলে জগতে আর ভাগ্যের পরিহাস বলে কাহাকে?
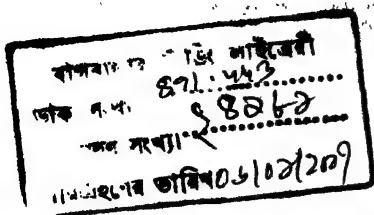
চারি

ছাত্র-জীবন—স্বদেশে

ভাগ্য যাহার যেমনই থাকুক না কেন, দিন কাহারও বসিয়া থাকে না—দিন কাটিয়া যায় আর মানুষের বয়স বাড়িতে থাকে। রবীন্দ্রনাথও বড় হইতে লাগিলেন।

একদিন "জল পড়ে পাতা নড়ে" পড়িয়া যে শিশুর কানে কবিত্বের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সেই শিশুর চক্ষু-কর্ণ যেন ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল।

শিশু রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়া যায়—তিনি তাহা নিঃশেষে উজাড় করিয়া উপভোগ করিয়া লন। ফুলের সুষমা, ধানক্ষেতের সবুজ সরসতা রবীন্দ্রনাথকে ফাঁকি দিতে পারে না, তিনি তাহা দেখিয়া ফেলেন—তন্ময় ভাবে তিনি লতাপাতা গাছ-পালায়, ঘাটে-মাঠে বনে-উপবনে কৌতুক-বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকেন!

রবীন্দ্রনাথের কানও যেন তাঁহার চোখের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া চলিতেছিল! পাখীর গান, পত্র-পুষ্পের মর্ম্মর ধ্বনি, নদীর কলরোল, নিদাঘ-বায়ুর বুকফাটা নিঃশ্বাস,—সব-কিছুতেই কি এক গোপন ভাষার ইঙ্গিত তিনি কানে শুনিতে পান! মোট কথা, "জল পড়ে পাতা নড়ে" কথা দুটির সুর-তরঙ্গ হইতে শিশু রবীন্দ্রনাথের

কানে যে কবিত্বের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা হইতেই বুঝি কবিত্বের উন্মেষ হইতে লাগিল!

ঠাকুর-পরিবারে অনেক কালের এক খাজাঞ্চি ছিলেন। তাঁহার নাম কৈলাস মুখুজ্যে। রবীন্দ্রনাথ ছড়া-পাঁচালী শুনিতে ভাল-বাসিতেন, কৈলাস মুখুজ্যে দু'-একদিন ছড়া আবৃত্তি করিয়াই তাহা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি রবীন্দ্রনাথকে খুশি করিতে হইলেই, ছড়া বা ছড়ার মতো একটা কিছু খুব তাড়াতাড়ি বলিয়া যাইতেন।

তাহা শুনিতে শুনিতে বালক রবীন্দ্রনাথের সারা মন মাতিয়া উঠিত—ছন্দের দোলায় তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন তালে তালে নাচিতে থাকিত! ইহা ছাড়া আর-একটা ছড়া ছিল রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয়। সে ছড়াটি ছিল, "বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এল বান!" তাঁহার শৈশব-স্মৃতির এই ছড়া সম্পর্কে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত!'

রবীন্দ্রনাথকে পড়াইবার জন্য গৃহ-শিক্ষকের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু ভাব-প্রবণ রবীন্দ্রনাথের মন পুঁথির পাতা ছাড়িয়া এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। কাজেই গৃহ-শিক্ষকের উদ্যম ও উপদেশ যেন বৃথাই প্রমাণিত হইতেছিল! কিন্তু বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী আরও দুটি ছেলে ছিল। একজন সোমেন্দ্রনাথ, অপর জন সত্যপ্রসাদ।

সমবয়সী হইলেও তাহারা রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা অল্প কিছু বড়।

সুতরাং তাহারা কিছু পূর্ব্বেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। সত্যপ্রসাদ কিছু চটকদার বক্তৃতা করিতে পারিত। ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে

> 'যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণ-বৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না।"

বালক রবীন্দ্রনাথের বুকের মধ্যে তখন লেখাপড়ার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা একটা বিজলী-চমকের ন্যায় ঝলসিয়া যাইত; কিন্তু সে লেখাপড়া গৃহকোণে অবস্থিত শান্ত ছেলেটির লেখাপড়া নহে, সে লেখাপড়া ছিল কত অজ্ঞাত রহস্যের খনি—ইস্কুলের লেখাপড়া। সুতরাং ইস্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ইহার ফল যাহা হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা 'জীবন-স্মৃতি' নামক পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> "যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমাদের মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাত সহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন: 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।' কান্নার জোরে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে অকালে ভর্ত্তি হইলাম।"

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ছয়, তাঁহার ইস্কুলের পড়া চলিতে লাগিল—কিন্তু পড়াশুনা হইল না কিছুই। তিনি লক্ষ্য করিলেন, সে ইস্কুলে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা অপেক্ষা বিচারের নামে

শাস্তির প্রচেষ্টাই ছিল বেশী। অপরাধী ছাত্রকে নানাভাবে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। কাহারও প্রসারিত হাতের উপর এক ডজন শ্লেট চাপাইয়া দেওয়া হইত, কাহারও মাথার উপর গোটা ইট চাপাইয়া তাহাকে ভারসাম্য রক্ষা করিতে বলা হইত; কেহ বা শাস্তিদাতা শিক্ষকের আদেশে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দিকে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া থাকিত। ইহা ছাড়া, বেত্রাঘাত ছিল সকলেরই উপরি পাওনা।

শাস্তির এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা লইয়া বালক রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই ইস্কুল হইতে বিদায় লইলেন এবং ইহার পর তিনি আট বৎসর বয়সে নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

কিন্তু বিধাতা যাঁহাকে উন্মুক্ত প্রান্তরে বিচরণশীল স্বাধীন অশ্বের ন্যায় মুক্ত বল্গায় ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, ইস্কুলের সীমাবদ্ধ শিক্ষাবিধি ও সংহত গণ্ডী তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? সুতরাং পুনরায় ইস্কুল পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইল—তিনি 'বেঙ্গল একাডেমি' নামে এক ফিরিঙ্গি-ইস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

কিন্তু ইস্কুল মাত্রই তাঁহার নিকট তখন জেলখানার কঠোরতা লইয়া স্বাধীনতার বিঘ্ন-স্বরূপ মনে হইত; সুতরাং এখানেও তাঁহার ভাল লাগিল না। এই সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—

> "এই স্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবুও হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্ম্মম, ইহার দেওয়ালগুলো পাহারাওয়ালার মত—ইহার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই। ইহা যেন খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স। কোথাও কোন সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ্ নাই,

ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালমন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্ব্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সঙ্কীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত।"

মনের ভাব যাঁহার এই রকম, ইস্কুলের পড়া আর তাঁহার কতখানি হইবে? সুতরাং ইস্কুলগুলি রবীন্দ্রনাথের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল। ইস্কুল আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হইল—তিনি ইস্কুল হইতে পলাইতে লাগিলেন।

পরবর্ত্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন—

"আমি ইস্কুল পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাশ করিনি, মাষ্টার আমার ভাবিকাল সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল-ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন, সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।"

কিন্তু ইস্কুলের পড়ার পরিণতি যাহাই হউক্ না কেন, বাড়ীতে পড়ার চাপ তাঁহার নিতান্ত কম ছিল না। গণিত, প্রাণি-বৃত্তান্ত, পদার্থ-বিদ্যা, 'মেঘনাদ বধ' কাব্য ও 'চারুপাঠ' জাতীয় কঠিন সাহিত্য—তাঁহাকে প্রত্যহই গৃহে পড়িতে হইত। তদুপরি ছিল কুস্তি লড়া ও সঙ্গীত শিক্ষা। মোটকথা, বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপেক্ষা গৃহের শিক্ষাই রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া উঠিল।

সাধারণ গৃহে সচরাচর এতটা সুযোগ হয় না। কারণ, গৃহে গৃহ-শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত শিক্ষামূলক আর কোন আবহাওয়া

অধিকাংশ গৃহেই নাই; কিন্তু ঠাকুর-পরিবারের আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সঙ্গীত, সাহিত্য, ললিত কলা ও কৃষ্টির প্রাচুর্য্য সেখানে বরাবরই ছিল। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের নিকট অনেক বড় বড় লোকেরই যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথ সমবেত ভাবে এই বিশিষ্ট আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিলেন। সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষায় অমনোযোগী হইলেও তিনি তৎকালীন প্রগতি-মূলক সর্ব্ববিধ শিক্ষার সংস্পর্শে ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিলেন।

পিতা দেবেন্দ্রনাথ নিজের শত কার্য্যের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে শিক্ষামূলক অনেক কিছু উপদেশ দিয়া তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। বেদ-উপনিষদের তত্ত্ব পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন।

দেশ-ভ্রমণ ব্যতীত কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহা উপলব্ধি করিয়া পুত্র রবীন্দ্রনাথকে লইয়া মাঝে মাঝে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইতেন। বোলপুর, সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, কানপুর, এলাহাবাদ, ডালহৌসী পাহাড়, অমৃতসর ইত্যাদি বহু স্থানেই তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন; পুত্র রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত মুগ্ধ চিত্তে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার কল্পনা-রাজ্যের সীমা ও সমৃদ্ধি অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া লইলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আবার তিনি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন—এবার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। এইখানে ফিরিঙ্গি ছেলেদের সঙ্গে পড়িতে পড়িতে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার স্ফুরণ হইতে থাকে।

তাঁহার ভাবুক মনের অন্তরালে এতদিন গোপনে যে সাহিত্য ও কবিত্ব-রস সঞ্চিত হইতেছিল, এখন তাহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' ও 'ম্যাকবেথে'র বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়া ফেলিলেন। এতদ্ব্যতীত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'অভিলাষ' নামে একটি কবিতা ও তৎকালীন দ্বৈভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে একটি লেখাও তাঁহার এই সময়ের রচনা। বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার এই প্রথম পদার্পণের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বৎসর!

রবীন্দ্র-চরিত্র সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে কবিত্ব-রসের অনুভূতি হয় সেইদিন যেদিন তিনি সর্ব্বপ্রথম দুটি কথার এক ঝঙ্কার শুনিতে পান, "জল পড়ে পাতা নড়ে!" তারপর যেদিন তিনি খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যের কাছে ছড়ার আবৃত্তি শুনিতে পান ও যেদিন তাঁহার কানে প্রথম প্রবেশ করিল এক অপূর্ব্ব রাগিণী "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান," জীবনে সেই দিনই বুঝি তিনি প্রথম সাহিত্য-রস সম্ভোগ করিলেন! আর তাই বুঝি তিনি তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে বলিয়াছেন—

> "শিশুকালের সাহিত্য রস সম্ভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জমিয়া আছে!"

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জীবনে সাহিত্য-রসের অনুভূতি ও সাহিত্য-রসের সম্ভোগ-সম্পর্কে দুটি ইতিহাস পাওয়া গেল; কিন্তু তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চা ও সাহিত্য-স্ফুরণের উৎস কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান। সুতরাং স্বভাবতঃই আশা করা যায়, তাঁহার বাল্যজীবন হয়তো ঐশ্বর্য্যের পরিবেশেই কাটিয়া থাকিবে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহার প্রকৃত পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে করিয়াছি। তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও বাল্যজীবন ভৃত্যদের সংস্পর্শেই অতিবাহিত হইয়াছে। সুতরাং ভৃত্যদের সেই পরিবেশের মধ্যেই তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চার উৎপত্তি।

তিনি তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—

> "চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল, তাহা লইয়াই আমার সাহিত্য-চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্য-শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান।"

সাহিত্য-চর্চ্চার পরেই সাহিত্য-স্ফুরণ। কবে সেই স্ফুরণের প্রথম বিকাশ, সে আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। সুতরং সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আজ সকলেরই ইহা বোধগম্য হইবে যে, কবির জীবনে কবিত্বের স্ফুরণ হইয়াছিল সম্পূর্ণ এক স্বাভাবিক ঘটনায়। বাল্মীকি বা নিউটনের স্ফুরণ যে ভাবে সম্ভবপর হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের স্ফুরণও ঠিক্ তেমনই ভাবে উদ্ভুত।

কিন্তু তাঁহার কাব্য-চর্চ্চা বা সাহিত্য-চর্চ্চা যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, সাধারণতঃ কোন ধনীর গৃহে তাহা আশা করা যায় না। ভৃত্যদের পরিবেশের মধ্যে, তৈলসিক্ত ছিন্ন পুঁথি লইয়া তাঁহার সাহিত্যিক চর্চ্চা। তারপর বাকি থাকে শুধু সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্যম। সে উদ্যমের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশের নিকট ঋণী।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ একদিন রবীন্দ্রনাথকে

> "তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরে যোগাযোগের রীতি-পদ্ধতি বুঝাইয়া দিলেন।"

এমনই আকস্মিক ভাবে একদিন কাব্য-প্রণালীর যে খাত খনন করা হইল, কাব্যের পরিপ্লুত জোয়ারে তাহাই একদিন উচ্ছ্বসিত ভাব-ধারায় সমগ্র বিশ্ব সিক্ত ও সরস করিয়া দিয়াছে!

পাঁচ

ছাত্র-জীবন—বিদেশে

জননী বর্ত্তমানেই যে ছেলেকে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দাস-বংশের রুদ্র শাসনে থাকিতে হইয়াছে, জননীর অভাবে তাহার যে কি অবস্থা হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন।

শিশু রবীন্দ্রনাথের অবশেষে তাহাই হইল! তাঁহার মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় জননী সারদা দেবী তাঁহার স্বামী ও পুত্র-কন্যাদিগকে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

জননীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুব বেশী সম্পর্ক না থাকিলেও মাতৃ-শোকে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। সেদিনের সেই ঘটনায় তাঁহার মনের মধ্যে যে বিপর্য্যয় হইয়াছিল, বড় হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> "স্তিমিত প্রদীপে অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য বুকটা দমিয়া গেল। কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না।"

মৃতা জননীর শান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া তিনি তাহা মৃত্যুর করাল স্পর্শ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

> "সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম, তাহা সুখ-সুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।"

মায়ের মৃত্যুতে সংসারের ও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেরও যে কত বড় একটা অভাব ঘটিয়া গেল, বালক রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তাহা কিছুই

বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু তারপর মায়ের মৃতদেহ যখন সদর দরজা দিয়া বহন করিয়া সকলে শ্মশানের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল,

"তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতেও এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘর-করনায় মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি অভিভূত হইয়াই পড়িলেন, এবং আর বিদ্যালয়ে পড়িবেন না বলিয়া বাঁকিয়া বসিলেন!

পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন—উপদেশ ও তিরস্কার—নানা ভাবেই তাঁহাকে ইস্কুলে পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা হইল! অবশেষে তাঁহারা বাড়ীতেই ভালরূপে পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন।

ব্যবস্থা হইল বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তবু মন বসিল না—আত্মীয়-স্বজনগণ দেখিলেন, এই একগুঁয়ে ছেলেটি যেন কিছুই না শিখিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে!

ঠাকুর-পরিবারের ন্যায় একটি সুশিক্ষিত, মার্জ্জিত-রুচি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে হইয়া রবীন্দ্রনাথ যে এমন অশিক্ষিত ও অনুৎসাহী হইয়া থাকিবেন, ইহা খুবই অপমান ও অসম্মান-জনক, তাহাতে সন্দেহ নাই! সুতরাং তাঁহারা অবশেষে স্থির করিলেন, রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে পাঠানো হইবে।

বেশী কিছু লেখাপড়া না শিখিলেও, বিলাত-ভ্রমণের কিছু

উপকারিতা আছে এবিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত ছিলেন। কারণ, দায়ে পড়িয়া সেখানে সকলকেই ইংরেজী শিখিতে হয়, নতুবা কথাবার্ত্তা বলিবারই কোন উপায় থাকে না! তাহা ছাড়া, চাল-চলন ও আদব-কায়দায় একটা বিশিষ্ট সভ্যতা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইবেই। সুতরাং তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়াই সকলের অভিপ্রেত হইল।

বহুদিন পরে—পরিণত বয়সে—কবি রবীন্দ্রনাথ 'মিলান্' বন্দরে এক বক্তৃতা-কালে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের এই মহৎ উদ্দেশ্য নিজেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন—

> "বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ছাপ পাইতে হইলে যে ধরাবাঁধা শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক হয়, আমি তাহার সব কিছুই বর্জ্জন করিয়াছিলাম। স্বভাবতঃই আমি ছিলাম একজন স্কুল-পালানো ছেলে, আমি কখনো আমার ক্লাশে যোগদান করিতে চাহিতাম না। সুতরাং আমি গুরুজনদিগের নিকট এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহারা তখন আমাকে বিলাতে পাঠানো স্থির করিলেন। তাহাতে বাধ্য হইয়াই ইংরাজী ভাষা শিখিতে হইবে এবং তাঁহাদের মতে আমাকে কিছু সুসভ্য করিয়াও ছাড়িবে।" *

* "I avoided all kinds of educational training that could give me any sort of standardised culture stamped with a university degree ......Being a truant by nature, I had always refused to attend my classes, and thus having become a problem to my elders, they had decided to send me to England to learn under compulsion the language which according to their notion, would give me the stamp of respectability."

কবিগুরুর মাতা ৺সারদা দেবী

রবীন্দ্রনাথ—লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায়

রবীন্দ্রনাথের মেজদা' সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে একজন সিভিলিয়ান—জাঁদরেল হাকিম। বিলাতে পাঠাইবার পূর্ব্বে তিনি রবীন্দ্রনাথকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে বিলাত যাত্রার উপযোগী করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

আমেদাবাদে এক পার্শী মহিলা রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজী সাহিত্য ও বিলাতী আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইভাবে তাঁহাকে ঘসিয়া-মাজিয়া অবশেষে ইংরেজী ১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার দাদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লইয়া এস্. এস্. "পুণা" জাহাজে বিলাতে রওয়ানা হইলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারা তখন ব্রাইটনে বাস করিতে-ছিলেন। সুতরাং আশ্রয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের কোন অসুবিধা হইল না—তিনি সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রাইটনের এক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন, কিন্তু পরে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিতের পরামর্শে তাঁহাকে লণ্ডনের এক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বৌ-ঠাকুরাণী ডেভনশায়ারে স্থান-পরিবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকেও সেইখানেই আনয়ন করা হইল।

কিন্তু ডেভনশায়ারে বেশীদিন তাঁহার বাস করা হইল না। তিনি পুনরায় লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে যোগদান করিলেন। এইখানে বিখ্যাত লর্ড মোর্লির ভাই প্রোফেসার হেনরী মোর্লির নিকট তিনি ইংরেজী সাহিত্য পড়িতেন; তাহা ছাড়া,

ইউরোপীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি বিষয়েও তিনি মনোনিবেশ করিলেন।

বিলাতে তাঁহার ছাত্র-জীবন বছর দেড়েক মাত্র। কথা ছিল, তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিবেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সহসা তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। সুতরাং আর অপেক্ষা না করিয়া, ব্যারিষ্টার না হইয়াই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

বিদেশে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভা নীরব ছিল না, তাহা বরং উত্তরোত্তর বিকশিতই হইতেছিল। "ভারতে ইংরেজ" (Englishmen in India) নামে তিনি সেখানে ইংরেজী ভাষায় এক রচনা লিখিয়াছিলেন। প্রোফেসার মোর্লি তাহা পড়িয়া তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচনা-শক্তি ও যুক্তি-তর্কের উৎকর্ষে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হন।

রচনাটি শাসক জাতির পক্ষে একেবারেই মুখরোচক ছিল না; কারণ, ভারতে ইংরেজদিগের কুশাসন ও স্বার্থপরতাই ছিল রচনাটির বিষয়-বস্তু। প্রোফেসার মোর্লি তথাপি যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও যুক্তি-তর্ক কত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল!

প্রোফেসার মোর্লি, রবীন্দ্রনাথের সেই রচনা পড়িয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,

"তোমরাও এই রচনাটি একবার পড় ; আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য করিয়া

যাও, ভারতের ইংরেজদিগের কোথায় কোথায় কুশাসন ও কুকীর্ত্তি রহিয়াছে! কারণ, ভবিষ্যতে তোমাদের অনেকেই হয়তো ভারতবর্ষে যাইবে। ব্রিটিশ-শাসনের কুকীর্ত্তিগুলি মনে রাখিলে, তখন হয়তো প্রতিকার করা তোমাদের পক্ষে সহজ হইবে।" *

বিলাতে থাকিতে তিনি ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার ইউরোপের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সমালোচনার শক্তি তাহাতে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ পিতার আহ্বানে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার পর হইতে অধিকাংশ সময় চন্দননগরে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট বাস করিতে লাগিলেন।

রবীন্দ্র-জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবীর প্রভাব নিতান্ত কম নহে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুগায়ক। সুতরাং সর্ব্ব-কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকেও তিনি সঙ্গীতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে—সাহিত্য-সাধনায়, নাট্যাভিনয়ে এবং সঙ্গীত-রচনায়ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রচুর প্রেরণা যোগাইয়াছেন।

এমন কি, রবীন্দ্রনাথের রচিত গান তিনি স্ব-রচিত 'পুরু-বিক্রম নাটক' ও 'সরোজিনী' নাটকে সন্নিবেশিত করিতেও ইতস্ততঃ করেন

* Prof. Morley was greatly impressed by the genius of Rabindranath and asked his British students to note what he had written, since many of them were likely to go to India in some capacity or the other. —*The Sentinel of the East* (Durlab Singh).

নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে গান লিখিয়া দিয়াছিলেন, আজও তাহা অমর হইয়া সকলের কানে ঝঙ্কার তুলিতেছে,—

"জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা!"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ন্যায় কাদম্বরী দেবীও দেবর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীত-সাধনায় প্রধান উৎসাহদাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও ভ্রাতৃবধূকে জননীর ন্যায় সম্মান করিতেন ও খুবই ভালবাসিতেন। সুতরাং সহসা কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হইলে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন।

পত্নী-বিয়োগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও মুসড়িয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যাবতীয় আনন্দ ও কর্ম্মশক্তি যেন তখন হইতেই অন্তর্হিত হইয়া গেল! রবীন্দ্রনাথের জীবনেও একটা সুমধুর সম্বন্ধের মাঝখানে সমাপ্তি-সূচক পূর্ণচ্ছেদ আসিয়া পড়িল!

ছয়

সাহিত্য ও সমাজ

স্নেহময়ী কাদম্বরী দেবী স্বর্গে চলিয়া গেলেন ; কিন্তু ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে, মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি জানিয়া গিয়াছিলেন, দেবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কিশোর বয়সের মধ্যেই সাহিত্যিক ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা,' কবিতা-সংগ্রহ 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত', নাটক 'রুদ্রচণ্ডী', এবং উপন্যাস 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি তখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও উচ্চ-প্রশংসিত। তাঁহার 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' পড়িয়া মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা কমলার বিবাহ-আসরে তিনি তাহা অতি অদ্ভুতভাবে একদিন প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

বিবাহ-আসরে বিশিষ্ট অতিথির মর্য্যাদা-হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় একছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া দেন এবং রমেশচন্দ্রকে বলেন, "রমেশ, তুমি এর 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' পড় নাই কি ? এই মালা 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র রচয়িতাকেই দেওয়া সঙ্গত।"

এই সকল পুস্তক রচনা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়ও লিখিয়া যাইতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায়

'ভারতী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছিল; রবীন্দ্রনাথ তাহাতে প্রথম সংখ্যা হইতেই লিখিয়া যাইতেছিলেন। ধারাবাহিক ভাবে ভারতীতে তিনি 'করুণা' ও 'ভিখারিণী' নামে দুইখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, অন্যান্য প্রবন্ধ ও কবিতার তো অন্তই ছিল না!

বিলাতে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথের লেখার বিরাম হয় নাই,—তিনি নিয়মিত ভাবেই প্রতিমাসে ভারতীর জন্য লেখা পাঠাইয়া যাইতেন। মোট কথা, মাত্র ষোল-সতেরো বৎসর বয়সের সময়ই রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকার একজন খ্যাতনামা লেখকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মাঝে মাঝে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় লেখা পাঠাইয়া, সভা-সমিতিতে কবিতা ও প্রবন্ধ-পাঠ এবং বক্তৃতা করিয়া, এবং 'সাধনা' নামে এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যৌবনের পূর্ব্বেই যে সাহিত্যিক মর্য্যাদা ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে।

তথাপি কেহ কেহ বলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত কবিতার উৎস সহসা তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট এক দিন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র। তিনি তখন কলিকাতার যাদুঘরের নিকটবর্ত্তী সদর ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন।

সেদিন সকাল বেলা জানালা খুলিতেই পৃথিবী যেন এক অপরূপ বেশভূষা লইয়া তাঁহার চোখের সম্মুখে উপস্থিত হইল! কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার মনঃপ্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল! তাঁহার হৃদয়ের

অন্তঃস্থলে কাব্য-রাগিণীর কোন্ এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল! তিনি তখনই লিখিয়া ফেলিলেন—

"না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,—
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।"

ইহাই রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। ইহার সঙ্গে 'প্রভাত-উৎসব' নামে অপর একটি কবিতার সংযোগে তাঁহার 'প্রভাত-সঙ্গীত' গ্রন্থের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে যখন এইরূপে এক ভাবের জোয়ার আসিয়া গিয়াছিল, সেই সময় তাঁহার সাংসারিক জীবনেও অপর এক নূতন জোয়ারের সৃষ্টি হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সময় তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন।

তাঁহাদের ঠাকুর-এষ্টেটের তত্ত্বাবধায়কের নাম ছিল বেণীমাধব রায় চৌধুরী। তাঁহার কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সুস্থির হইল।

ভবতারিণী দেবী ঠাকুর-পরিবারের উপযোগী যথেষ্ট শিক্ষিতা ও আধুনিক রুচি-সম্পন্না ছিলেন না। তথাপি মহর্ষির ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ-কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ২২ বৎসর, আর ভবতারিণীর বয়স ১৪ বৎসর।

বধূরূপে ঠাকুর-পরিবারে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভবতারিণীর নাম পরিবর্ত্তন করা হইল—তাঁহার নাম হইল মৃণালিনী।

রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সন্তান হইয়াছিল—তিন কন্যা ও দুই পুত্র। প্রথমা কন্যা বেলা ওরফে মাধুরী দেবীর বিবাহ হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর তৃতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে। তিনি মজঃফরপুরে ওকালতি করিতেন, পরে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা ওরফে রাণীকে বিবাহ করেন সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নামে এক উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক। আর তৃতীয়া কন্যা মীরা দেবীর বিবাহ হয় বরিশাল জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সহিত। প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যা তাঁহাদের বিবাহের পরে, অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন কন্যাদের মধ্যে একমাত্র মীরা দেবী জীবিত আছেন।

মীরা দেবীর একটি কন্যা আছেন; তাঁহার নাম নন্দিতা দেবী। গুজরাটের এক অধ্যাপক ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ ১৩১৩ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ কলেরা রোগে, মাত্র বারো বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথই এখন কবির একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিবাহের পরে কিছুকাল অনেকটা স্বাধীনভাবেই ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক কখনও দার্জ্জিলিং, কখনও গাজিপুর, কখনও

বা শোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু মহর্ষি একদিন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সংসারী করিবার জন্য, তাঁহার স্কন্ধে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব সমর্পণ করিয়া বসিলেন। সুতরাং জমিদার-নন্দন রবীন্দ্রনাথ সেইদিন হইতে সত্যই নিজেও জমিদার হইয়া বসিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। কবি রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনায়ও তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মকুশলতারই পরিচয় দিয়াছেন।

জমিদার যে কেবল প্রজাদের অর্থশোষণের নিমিত্ত হৃদয়শূন্য কোন যন্ত্রবিশেষ নহে, জমিদার রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। * প্রজাদের দুঃখে বিপদে তিনি সহানুভূতির বন্যায় ভাসিয়া যাইতেন—তাহাদের রোগ হইলে তিনি নিজে হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের বাক্স লইয়া সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতেন।

প্রজাদিগকে তিনি যে কতটা ভালবাসিতেন, তাঁহারই লেখায় তাহা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

> "এই সমস্ত অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড় একটি কোমল মাধুর্য্য আছে। বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশ জোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষা-ভুষোদের আপনার লোক মনে করতে একটা সুখ আছে।...এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না।"

---

* এ বিষয়ে কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকাদিগকে আমি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ" পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিতে এই ধরণের আরও কত কথাই আছে! তিনি ইহাদিগকে যেন ঈশ্বরের কতকগুলি অসহায় শিশুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই অসহায় শিশুদের মুখে খাবার তুলিয়া দিতে হয়, নতুবা তাহারা একেবারেই অসহায় ভাবে জীবন যাপন করে। জননী বসুন্ধরার স্তনরস শুকাইয়া গেলে, তাহারা শুধু কাঁদিতেই পারে, কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে না; কিন্তু যেই তাহাদের ক্ষুধা মিটিয়া যায়, তখনই তাহারা নিজেদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এক নিমেষে ভুলিয়া যায়! *

প্রজাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এমনই উচ্চ ধারণা! কিন্তু তাই বলিয়া স্তাবকতায় বা ছলনায় ভুলিয়া তিনি যে কখনও দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেন নাই, সে রকম কথাও শুনা গিয়াছে। একবার তাঁহার কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ কাহাকেও বলিয়াছিল, "আপনারা কেবল প্রভাত-রবির রূপই দেখিয়াছেন; কিন্তু মধ্যাহ্ন-রবির রূপ দেখিতে হইলে একদিন জমিদারের কাছারি-বাড়ীতে যাইবেন।"

কিন্তু কেবল জমিদারি পরিচালনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মঠ যৌবন নিরুদ্ধ রহিল না। ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের আগ্রহে, তিনি তাঁহাদের সহযোগে ব্যবসায়ক্ষেত্রেও নামিয়া পড়িলেন।

---

* "I feel a great tenderness for these peasantfolk, our ryots—big, helpless, infantile children of Providence, who must have food brought to their very lips, or they are undone. When the breasts of mother earth dry up, they are at a loss what to do, and can only cry. But no sooner is their hunger satisfied than they forget all their sufferings."

—*The Sentinel of the East* (Durlab Singh)

বিপুলভাবে কলিকাতায় কাপড়ের দোকান ও কুষ্টিয়ায় চটকল খোলা হইল, আমদানী-রপ্তানী ও ক্রয়-বিক্রয় লক্ষ্য করিবার জন্য দালাল ও 'সেলস্‌ম্যান্'দিগের ঘন ঘন আনাগোনা চলিতে লাগিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্পকালের মধ্যেই নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইল যে, রবীন্দ্রনাথ আর যাহাই হউন না কেন, তিনি ব্যবসায়ী নহেন। সুতরাং সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ব্যবসায় গুটাইতে হইল। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র আর্থিক ক্ষতি একাকী বহন করিয়া প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

জমিদারি এবং ব্যবসায়ের আর্থিক কচ্‌কচির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভা অবিরাম স্বচ্ছন্দ গতিতেই বহিয়া যাইতেছিল। গ্রন্থ-রচনা, প্রবন্ধ-রচনা, সভা-সমিতিতে যোগদান ও নিজের অভিমত প্রকাশ—ইত্যাদি যাবতীয় কাজই তিনি সুষ্ঠুভাবে করিয়া যাইতেছিলেন। এমন কি, সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী ধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই; কিন্তু এই কাজে ব্রতী হইয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় মনীষী সাহিত্যিকের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' কাগজ তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; তৎপরিবর্ত্তে তখন 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও চন্দ্রনাথ বসুর সহযোগে বঙ্কিমচন্দ্র তখন নব্য হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা সুরু করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকরূপে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই।

সুদীর্ঘকাল এই বাদ-প্রতিবাদ ও কথা-কাটাকাটি চলিয়াছিল।

ইহার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিষম তিক্ততার সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পরলোক গমন করিলে উদার-হৃদয় রবীন্দ্রনাথ মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া শোকাভিভূত অন্তঃকরণে তাঁহার শবানুগমন করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, বঙ্কিমের স্মৃতি 'বঙ্গদর্শন' পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাহা পুনরায় মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

মোট কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কারকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেও তাহাতে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব কোনদিনই জন্মে নাই।

কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের এই সমাজ-সংস্কারক রূপ লক্ষ্য করিয়া দূরদর্শী ব্যক্তিগণ সেদিন কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন কিনা জানি না; করিলেও তাহা যে সেদিন অস্বাভাবিক হইত না, সে কথা অতি সত্য। কারণ, যে কবি ও সাহিত্যিকের দৃষ্টি যৌবনেই তাঁহার কল্পনা-কুঞ্জ হইতে স্বীয় সমাজের দিকেও আবর্ত্তিত হয়, তাঁহার দৃষ্টি যে অদূর-ভবিষ্যতে স্বীয় দেশ ও সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে না, সে কথা কে বলিতে পারে?

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

সাত

স্বদেশপ্রেম

রবীন্দ্রনাথের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও নানা-বিষয়ক অবদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সে যুগের একটু ইতিহাস জানা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল এমন এক সময়, দাবানলের শেষ বহ্নিটুকু যখন কেবল নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহার তাপ ও শেষ ধোঁয়াটুকু একেবারে মিলাইয়া যায় নাই!

ইংরেজী ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের আকারে ভারতের বুকে স্বাধীনতার যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কঠোর হস্তের বজ্র-নিষ্পেষণে তাহা তখন নিরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; তথাপি বিদ্রোহ ও অশান্তির বিষাক্ত আবহাওয়া সারাদেশের বায়ুমণ্ডলকে দূষিত ও পঙ্কিল করিয়া রাখিয়াছিল। শাসকবর্গের বজ্র-নিষ্পেষণ যেন সর্ব্বত্র সকলের বুকেই একটা ত্রাস ও বিরক্তির সঞ্চার করিয়াছিল! এমনই সময়ে—ইংরেজী ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

পিতা দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই কিছু ইংরেজ-বিরোধী ছিলেন। প্রবল স্বদেশপ্রেম তাঁহার হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় অতি গোপনেই বহিয়া যাইত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পিতৃ-ইতিহাস ও সময়ের স্রোত তাঁহাকে স্বদেশমুখী করিয়া তুলিবার পক্ষে সর্ব্বাংশে

অনুকূল ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে প্রায় তাঁহার শৈশব হইতেই আমরা স্বদেশের প্রতি মনোযোগী দেখিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ যখন নিতান্ত শিশু. তখন হইতেই ঠাকুর-পরিবার যে সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তন্মধ্যে একটি অনুষ্ঠান ছিল 'স্বদেশী মেলা'। সম্ভবতঃ বাঙ্গালীকে ঘরমুখো করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছয় বৎসর বয়সের এমনই এক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'স্বদেশী মেলা'র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

> "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।"

'হিন্দু মেলার' নানা অধিবেশনে দেশকে মূর্ত্ত দেবতা মনে করিয়া তাঁহার স্তব-গান করা হইত, দেশানুরাগের নানা কবিতা পাঠ করা হইত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> "হিন্দু মেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ীর সকলে তখন উৎসাহিত।....এই মেলায় গান ছিল মেজদাদার লেখা 'জয় ভারতের জয়,' গণ দাদার * লেখা 'লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কী করে,' বড় দাদার 'মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি'।"

রবীন্দ্রনাথও এমনই এক স্বদেশী মেলার অনুষ্ঠানে, মাত্র তেরো বৎসর বয়সে, 'হিন্দু মেলায় উপহার' নামে একটি দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেন।

* দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সহোদর গিরীন্দ্রনাথের পুত্র।

ভারতীয় 'কংগ্রেস' বা জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে দেশ-প্রসিদ্ধ দাদাভাই নৌরজী মহাশয় প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। সেই অধিবেশনের পুরাতন বিবরণী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, তাহার উদ্বোধন-সঙ্গীতের রচয়িতা ও সঙ্গীতকারী উভয়ই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট যে নূতন 'রাজদ্রোহ আইন' বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন 'কণ্ঠরোধ'। দেশপূজ্য নেতা বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়কে গভর্ণমেণ্ট যখন বে-আইনী ভাবে গ্রেপ্তার করিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখনও নীরব থাকিতে পারেন নাই। তিনি তীব্রকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, সরকারের বিরুদ্ধে তিলকের মামলা পরিচালনার জন্য তিনি স্বয়ং অর্থসংগ্রহে ব্রতী হইলেন।

পরবর্ত্তী বৎসরে কলিকাতায় সহসা মারাত্মক প্লেগের আবির্ভাব হইলে রবীন্দ্রনাথ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতার সহযোগে রোগীদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তারপর ঢাকা নগরীতে প্রাদেশিক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাতে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা বাংলাভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে জমিদারগণ চিরদিনই অসহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন, কখনও যোগদান করেন

নাই, রবীন্দ্রনাথ তীব্র কণ্ঠে ইহারও প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু তিনি নিজেও যে একজন জমিদার, সেকথা মনে করিয়া একবারও তাহাতে ইতস্ততঃ করেন নাই। মোট কথা, দেশের চিন্তা তখন হইতেই তাঁহার শিরা-উপশিরায় উষ্ণ প্রবাহের সঞ্চার করিতে লাগিল। ইহার ফলে, দেশের যখন যেখানে যত-কিছু সভা-সমিতি হইতেছিল, তিনি তাহাতে যথাসম্ভব যোগদান করিয়া স্বরাষ্ট্রের জন্য, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ভারতের অন্যতম সুযোগ্য সন্তান রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, 'স্বদেশী সমাজ'। সে যুগে—যখন পর্য্যন্ত ইংরেজদের প্রতি ভারতীয় বিদ্বেষ বর্ত্তমান যুগের ন্যায় জমাট হইয়া উঠে নাই,—এমনই সময়ে 'স্বদেশী সমাজে'র ন্যায় প্রবন্ধ বলিষ্ঠ মনেরই পরিচায়ক। কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, কেবল আবেদন-নিবেদনে কখনও দেশ স্বাধীন হইতে পারে না, সভা-সমিতিতে কেবল Resolution বা প্রস্তাব পাশ করিয়াও কোন লাভ নাই। দেশের যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে সেজন্য আবশ্যক আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরশীল মন।

তাঁহার লিখিত নানা প্রবন্ধেই তিনি তাঁহার দেশবাসীকে পুনঃ পুনঃ এইভাবে পথ নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হন নাই—

> "আমাদের দেশে Political agitation (রাজনৈতিক আন্দোলন) করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।... ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।...ইংরেজের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর

বার্লিনে এলবার্ট আইনষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৩০)

কিশোর রবীন্দ্রনাথ (বয়স ১৫ বৎসর)
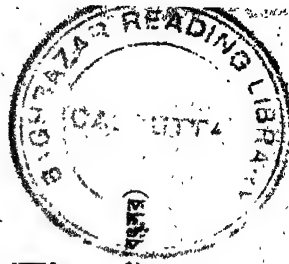
সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী।"

সভা-সমিতিতে বক্তৃতার বহর লক্ষ্য করিয়া তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"এখন 'ভ্রাতাগণ', 'ভগ্নীগণ,' 'ভারতমাতা' নামক কতকগুলো শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে—ও তারাবাজির মতো উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উঠিতেছে। অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায়, ও ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এমন দুশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোন সুবিধা হয় না, আর ঘরের কোণে মিট্ মিট্ করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিলেও অনেক কাজ দেখে।" *

রাজকুটুম্ব, ঘুষোঘুষি, রাজাপ্রজা প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ধে দেশসেবা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৯০৫ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জ্জন রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির পরিচালনায় বঙ্গ-বিভাগ করিলে, সমগ্র বাংলায় যখন তাহার প্রতিবাদে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিল, কবি রবীন্দ্রনাথ তখন তাহাতেও ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

বঙ্গচ্ছেদের প্রায় অব্যবহিত পরেই কলিকাতা টাউন-হলে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহূত হইল। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি

* ভারতী ১২৮৯, চৈত্র।

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগিতা ও সর্ব্ববিষয়ে দেশবাসীদের স্বাবলম্বনের পক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, তাহারই ফলে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন বা 'বয়কট' আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইল; এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনাও যে তাঁহারই অনুসৃত নীতিমাত্র, সেকথা বলিলেও সম্ভবতঃ কোন অত্যুক্তি করা হইবে না।

সরকারের সহিত অসহযোগ করিয়া তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার মনোবৃত্তি ও বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের সঙ্কল্প লইয়া যে কয়েকটি বলিষ্ঠ ব্যক্তির তৎকালে অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে আজও তাঁহাদের নাম অমর হইয়া আছে; কিন্তু তাই বলিয়া একথা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, সমগ্র আন্দোলনের মূল আত্মাই ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থক করিবার জন্য, বাঙ্গালীর ভ্রাতৃত্ব-বোধ সজাগ রাখিয়া তাহাদের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন ও একতা সুদৃঢ় করিবার জন্য, রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বতোভাবেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বঙ্গ-বিভাগের স্মরণীয় দিবসকে ব্যথা-বেদনার সুতীক্ষ্ণ শলাকায় বাঙ্গালীর বুকে গাঁথিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি 'রাখী-বন্ধন' উৎসবের প্রবর্ত্তন করিলেন এবং নিজে সেজন্য 'রাখী-সঙ্গীত' রচনা করিয়া দিলেন।

প্রত্যেকটি বাঙ্গালী যখন জননী জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ স্মরণ করিয়া, শোক-সন্তপ্তচিত্তে অরন্ধন-পর্ব্ব পালন করিয়া, একে অন্যের হাতে

রাখী-বন্ধন করিয়া দিতেন এবং সমগ্রভাবে বাংলার বুক চিরিয়া যখন রবীন্দ্রনাথের রাখী-সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিত—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
ধন্য হউক্‌, পুণ্য হউক হে ভগবান্‌,"

তখন প্রবল-প্রতাপশালী ইংরেজ রাজপুরুষগণও অস্বস্তি বোধ না করিয়া পারেন নাই!

"বাংলাদেশে তখন একটা সুবৃহৎ ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল, তেমন জোয়ার বুঝি এদেশে ইতিপূর্ব্বে কখনও আসে নাই, তেমন ভাবে বাংলাদেশ বুঝি আর কখনও আন্দোলিত হয় নাই। সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ ভগীরথের মত বাংলাদেশের উপর দিয়া ভাগীরথীর ধারা বহাইয়া দিলেন।....গানে—কবিতায়—প্রবন্ধে—বক্তৃতায় বাংলাদেশ যেন তাঁহার মুখে ভাষা পাইল!" *

বাংলার শিরা-উপশিরায় দেশানুরাগের উষ্ণ প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়া এক নূতন জীবন-স্পন্দনের সৃষ্টি করিল, সারা বাংলার পল্লী-নগরী রবীন্দ্রনাথের রচিত দেশানুরাগের সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিল—

"জানিনা তোর ধন-রতন
আছে কিনা রাণীর মতন,
এই জানি শুধু ভরে মন
তোমায় ভালবেসে,
সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।"

---

* রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়)

রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে বাংলার যুব-সমাজ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলে, তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে নিরক্ষর অধিবাসীদিগকে দেখাইয়া তাহাদের মধ্যে জন চেতনা উদ্রেক করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

সুষুপ্ত নির্জ্জীব বাংলায় দেশানুরাগের প্রবল বন্যা সারা দেশ ভাসাইয়া লইয়া চলিল; রবীন্দ্রনাথ তখন স্বয়ং কর্ণধারের আসনে বসিয়া তাঁহার দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া সঙ্গীতের তান তুলিলেন—

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।"

কিন্তু সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ জানিতেন দেশ-মাতৃকার আহ্বানে হয়ত সকলে সাড়া দিবে না; তাই তিনি পূর্ব্বেই সেজন্য তাঁহার বীণার তানে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়াছিলেন—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে।"

পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইলেও কেহ যেন হতাশ হইয়া না পড়ে এই উদ্দেশ্যে তিনি গাহিলেন—

"তা বলে ভাবনা করা চলবে না,
বারে বারে ঠেলতে হবে
হয়ত দুয়ার খুলবে না,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

বাংলার আকাশে-বাতাসে বনে-উপবনে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত যেভাবে দেশপ্রেমের নবচেতনার সঞ্চার করিল, তাহাতে সদ্যঃসৃষ্ট পূর্ব্ববঙ্গের লেফ্টেনাণ্ট গভর্ণর ফুলার সাহেব (Sir B. Fuller) শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জন-সাধারণকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য বিপুল গুর্খা-বাহিনী আমদানী করিলেন এবং সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও বলিতে ইতস্ততঃ করিলেন না, "হয়ত রক্তপাতের দরকার হইবে।"*

নেতৃস্থানীয় মনীষী ব্যক্তিগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, প্রতিবাদে নানাস্থানে সভা-সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথও এ সময় সকলের পুরোভাগে আসিয়া, তাঁহার উদাত্ত সবল কণ্ঠে গাহিলেন—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে মোদের
ততই বাঁধন টুটবে।"

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলে তাঁহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহারই অমর সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্র সকলের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল, "বন্দে মাতরম্!"

অতীতে মোগল-শাসনকালে দিল্লীর রাজশক্তির যে আতঙ্ক হইয়াছিল, বাংলায় ব্রিটিশ রাজশক্তিরও তখন সেই অবস্থাই হইল।

---

* Sir B. Fuller......actually threatened the respectable people saying, "Bloodshed may be necessary."

—*The Sentinel of the East.*

তাঁহাদের মনেও বুঝি মোগল শাসকদিগের কথাই উদয় হইতেছিল, তাঁহারাও বুঝি তখন মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিলেন—

"দিল্লী প্রাসাদ-কূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে!
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে
নিবিড় নিশীথ টুটে,
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে!"

ব্রিটিশ শাসকগণ তখন তাঁহাদের দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে—চতুর্দ্দিকে "বন্দে মাতরম্" শুনিতে পান, আর সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। ইহার ফলে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত নিষিদ্ধ করিয়া এক নূতন সার্কুলার জারী হইল।

ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত ছাত্রগণ এক সভা আহ্বান করিলেন। আর তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে আসিয়া সভাপতি-রূপে দণ্ডায়মান হইলেন কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

অনলবর্ষী বক্তৃতায় তিনি সরকারী স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ জানাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে, তাঁহারই গানের তালে তাহাদের মূর্ত্ত প্রতিবাদ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—

"বিধির বিধান কাটিবে তুমি কি এমনি শক্তিমান্?
তুমি কি এমনি শক্তিমান্?"

মোট কথা, বাংলার সেই স্মরণীয় যুগে রবীন্দ্রনাথ যে কি করিয়াছিলেন,—তাঁহার সাহিত্যে সাধনায়, গানে ছন্দে যে কোন্ রাগিণী

ঝঙ্কার তুলিয়া নিথর-নিঃস্তব্ধ বাংলার বুকে যে কি মহান্ আলোড়ন তুলিয়াছিল, সেকথা আজ ভাবিলেও হর্ষ-বিস্ময়ে দেহ-মন পরিপূর্ণ হইয়া যায়! রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া স্বদেশী যুগের সেই ইতিহাস লেখার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র, একথা আজও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বাংলাদেশের অন্যতম কৃতী সন্তান আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার অমর লেখনীতে কত ভাবেই তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! *

আচার্য্য রায় এ কথাও বলিয়াছেন যে, সেযুগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি কর্ম্মীর আদর্শ এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষকে যদি ভাবের আদর্শ বলা হয়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নব্য ভারতের জাতীয়ত্ব-বোধের আদর্শ। §

আচার্য্য রায় রবীন্দ্রনাথকে কেবল কবি হিসাবেই বিচার করেন নাই। কবির ছন্দ ও কবির উচ্ছ্বাস ভাব-প্রবণ মানব-হৃদয়কে অতি

* "When there surged over Bengal in 1905 the waves of an awakened self-consciousness and nationalism, he was found in the very forefront of the national movement, inspiring it with the soul-stirring national songs, stabilizing the emotional excitement with his thoughtful discourses, instinct with the spirit of constructive nationalism......

When the beautiful '*Rakhi-bandhan*' ceremony was instituted to affirm the unity of Bengal in spite of official fiats, it was Rabindranath who pronounced its '*Mantra*'. —*Golden Book of Tagore*

§ "If Surendranath represented the practical side, and Bepinchandra Pal and Arabindo Ghosh the passionate side, Rabindranath incarnated the idealistic side of the new Indian nationalism." —*Sir P. C. Ray.*

সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলে; কিন্তু সাধারণতঃ গদ্য প্রবন্ধের বুকে কবিতার তরল স্রোত দেখা যায় না—সুতরাং কবি সহজেই যাহা করিতে পারেন, গদ্য প্রবন্ধ-লেখক তাহা পারেন না।

কিন্তু আচার্য্য রায় বলিয়াছেন, সেই অগ্নিযুগে রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে যে সকল বলিষ্ঠ গদ্য প্রবন্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকেও যেন ম্লান করিয়া ফেলিয়াছিল! *

রবীন্দ্রনাথ তখন কেবল গানে কবিতায় ও বক্তৃতায় তাঁহার দেশবাসীদিগকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, যাহাতে সাফল্যের সহিত স্বদেশী আন্দোলন পরিচালিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি এক জাতীয় ধনভাণ্ডারও খুলিয়াছিলেন। সারা বাংলার ছাত্র-সমাজের নিকট তিনি তখন এত বেশী প্রিয় ও বরেণ্য যে, তাঁহার আবেদনে মাত্র একদিনের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়া গেল!

কিন্তু এই জনপ্রিয় নেতা রবীন্দ্রনাথই মাত্র বছর-দুয়েকের মধ্যে—১৯০৭ সালে রাজনীতির প্রকাশ্য ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে কেহ কেহ তাঁহাকে 'ভীরু' আখ্যা দিলেন, কেহ বা অসংযত ভাষায় বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেন। কিন্তু তিনি নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া, শুধু সংক্ষেপে অভিমত প্রকাশ করিলেন, "রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে সামাজিক উন্নতি-বিধান কর্ত্তব্য।"

* "It was in these stirring days that the masculine prose of Rabindranath's pen burst forth in its splendid virility and almost eclipsed the poet himself." —*Sir P. C. Ray.*

সহসা এইভাবে তাঁহার সরিয়া দাঁড়াইবার কারণ কি, তাহা আজও সঠিক ভাবে নির্ণীত না হইলেও, ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না যে, বিশেষ কোন কারণে তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত মতের অনৈক্য হওয়ার জন্যই তিনি নিষ্ক্রিয় দর্শকের আসন গ্রহণ করিলেন।

'প্রবাসী' মাসিক পত্রে তিনি 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' শীর্ষক যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় কর্ম্ম-পন্থার আভাষ পাওয়া যায়। তিনি তাহাতে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অশিক্ষা ও কুসংস্কার প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় যে তাঁহার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত, ইহা তাঁহার শৈশব জীবন হইতেই সুপরিস্ফুট হইয়াছে। 'স্বদেশী মেলা' উপলক্ষে তাঁহার দেশাত্মবোধক কবিতা, কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন-কালে তাঁহার স্বরচিত গান এবং অবশেষে স্বদেশী যুগে তাঁহার অনলবর্ষী বক্তৃতা ও চারণ কবির বিবিধ কবিতা ও সঙ্গীত—এ সমস্তই তাঁহার স্বদেশপ্রীতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ছিল হিংসা-বর্জ্জিত, অর্থাৎ অহিংস। তাহাতে নির্ভীক বীরের ন্যায় প্রাণ-বিসর্জ্জনের অনুপ্রেরণা ছিল, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত নরহন্তা পিশাচের নারকীয় ধ্বংসের উন্মাদনা ছিল না। সুতরাং তিনি যখন দেখিতে পাইলেন যে, স্বদেশপ্রীতির উত্তেজক সুরায় উন্মত্ত হইয়া অনুবর্ত্তী ও সহকর্ম্মিগণ ক্রমশঃ পদস্খলিত

হইয়া হিংসা ও রক্তপাতের পন্থায় নামিয়া যাইতেছেন, সম্ভবতঃ তখনই তিনি নিজের গতি সংযত করিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

অচিরেই প্রমাণিত হইল যে, উগ্র স্বদেশী আন্দোলন অবশেষে রক্তপাত ও বোমার আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইয়াছে! কলিকাতায় মাণিকতলা-অঞ্চলে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইল, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র-কুমার ঘোষ তাঁহার সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পুলিশের হাতে বন্দী হইলেন, মজঃফরপুরে ইংরেজ মহিলা খুন হইলেন। এইভাবে সারা দেশ যেন ধ্বংসের বারুদ-স্তূপে পরিণত হইল!

স্বদেশপ্রেমের মোহে যাঁহারা এইভাবে হিংসা ও রক্তপাতের পথ বাছিয়া লইয়া দেশকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং নিজেরাও লাঞ্ছনার চরম অভিশাপ ভোগ করিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম ও শৌর্য্যের প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এইভাবে কখনও স্বাধীনতা আসিতে পারে না। তাঁহার 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধ ইহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। একমাত্র অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনে যে কি অসম্ভব কাজও সম্ভব করা যায়, তিনি তাহা ধনঞ্জয় বৈরাগীর চিত্রে সুন্দরভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং আজ ভুলিলে সঙ্গত হইবে না যে, মহাত্মাজীর অসহযোগ অহিংস আন্দোলনের উৎসও ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ।

এসব জিনিষ বিচার করিলে স্বভাবতঃই মনে হয়, সম্ভবতঃ তিনি

তাঁহার অহিংস দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু মনীষী ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায় বলিয়াছেন—

> "কবি-ধর্ম্মের স্বরূপই এই যে, কবি একবার যে রস, যে রহস্য, যে ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, ঠিক সেই রস, সেই রহস্য সেই ভাবেই আবার আস্বাদন করিবার আগ্রহ আর তাঁহার জাগে না।"*

সুতরাং স্বদেশী যুগে কবি রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার রসসৃষ্টি করিয়াই অন্তরালে সরিয়া পড়িলেন ! কিন্তু নিজে তিনি দূরে সরিয়া গেলেও, যাঁহাদের কর্ম্মপন্থা হইতে তিনি সরিয়া গেলেন, তাঁহাদের সাহস ও স্বদেশপ্রেম তিনি শতমুখে প্রশংসাই করিয়াছেন !

তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মপন্থা তিনি অনুমোদন না করিলেও, তাঁহারা যে দেশপ্রাণ ও সাহসী বীর, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ সব যুবক তাঁহাদের দুঃসাহসিক কার্য্যের দ্বারা বাঙ্গালী জাতির 'ভীরু' অপবাদ স্খালন করিয়া সমগ্র জাতিকে গৌরবান্বিতই করিয়াছেন। †

দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এইভাবে অপর কোন দেশপ্রেমিককে তাঁহার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দানে কোনদিনই কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই ; পথ বা মত তাঁহাদের বিভিন্ন হইলেও, তিনি তাঁহার অন্তরের দেশপ্রীতির নির্ম্মল প্রবাহে ভেদ-বিসংবাদ সমস্তই এইভাবে চিরদিন ভাসাইয়া দিয়াছেন !

---

* রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা।

† "One thing of course which the poet could not help admiring was that, with their daring act, those young men had wiped out the reproach of cowardice". —*The Sentinel of the East.*

আট

মানবতা ও জাতীয় মর্য্যাদা-বোধ

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল কবি ও সাহিত্যিকই ছিলেন না, দেশপ্রীতির পুণ্যধারা যে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় বহিয়া যাইত, সে আলোচনা আমরা পূর্ব্ব-অধ্যায়ে করিয়াছি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না—স্বদেশে বা বিদেশে, জনগণের ব্যথা-বেদনায়ও তাঁহার অন্তঃকরণ ভারাতুর হইয়া উঠিত—তাঁহার সমগ্র হৃদয় তখন মানবতার আহ্বানে চঞ্চল হইয়া পড়িত।

ইতিহাস-পাঠক মাত্রই জানেন, পৃথিবীতে মাঝে মাঝে মারাত্মক মহামারীর ন্যায় যে কয়েকটি মহাযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ তাহাদের অন্যতম। সেই যুদ্ধকালে ভারতবর্ষ তাহার লোকবল ও অর্থবলে ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তিকে নিতান্ত কম সাহায্য করে নাই! বিনিময়ে ব্রিটিশের নিকট হইতে ভারতবর্ষ কিছু সদ্ব্যবহার আশা করিয়াছিল মাত্র! কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হইলে পৃথিবীতে যখন শান্তি সংস্থাপিত হইল, তখন দেখা গেল; ভারতবর্ষের ভাগ্য উন্নত হওয়া দূরের কথা, অবনতির চরম সীমান্তে তাহা নামিয়া গিয়াছে।

প্রত্যেকটি ভারতবাসী যখন ইংরেজের নিকট হইতে সহানুভূতি ও

সহৃদয় ব্যবহার-আশা করিতেছিল, ঠিক এমনই সময়ে ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞ ইংরেজ তাহাকে উপহার দিল 'রাউলাট বিল'।

ইহার বলে রাজশক্তি যে কোন ভারতবাসীকে যখন-তখন কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়াও গ্রেপ্তার করিতে পারিত, বিনা বিচারে ইচ্ছামত তাহাকে যতদিন খুশি জেলখানায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত।

জাতির গণ-চেতনা ও মুক্তি-আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই যে রাউলাট বিলের সৃষ্টি, ইহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্ব্বত্র ইহার বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ সুরু হইয়া গেল।

মহাত্মা গান্ধী বলিলেন, "এই আইনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতবাসীদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা।"

আইনে পরিণত করিবার জন্য বড়লাট বাহাদুর যেদিন ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন, মহাত্মা গান্ধী তাহার দ্বিতীয় রবিবাসরটিকে সমগ্র জাতির অবমাননাসূচক দিবস বলিয়া ঘোষণা করিলেন; এবং সেদিন সকলকে তিনি উপবাস-পূর্ব্বক যাবতীয় কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিলেন।

এইভাবে সমগ্র দেশব্যাপী যে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহাতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সদ্যঃ-প্রত্যাগত ইংরেজের ধৈর্য্য আর মানবতার বন্ধন মানিয়া সংযত থাকিতে পারিল না। সুতরাং নানা স্থানে গুলিগোলা চলিতে লাগিল। আমেদাবাদ, দিল্লী ও

অমৃতসহরে শাসকবর্গের নির্ম্মম গুলিতে অসংখ্য ক্ষুব্ধ দেশবাসী প্রাণ হারাইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার নরনারী এক সভার অধিবেশনের জন্য সমবেত হইয়াছিল। নিরস্ত্র জনতা কেবল তাহাদের মৌখিক প্রতিবাদ জানাইতেই সেইখানে আসিয়াছিল; কিন্তু পাঞ্জাবের মহামান্য গভর্ণর, স্যার মাইকেল ও'ডায়ার তাহাতেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি জেনারেল ডায়ারকে সঙ্গে লইয়া নিরীহ অস্ত্রহীন জনতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিপুল বিক্রমে সেইখানে আবির্ভূত হইলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই মাঠ তিন দিকে লোকালয়ের ঘরবাড়ীতে পরিবেষ্টিত, একদিকে একটিমাত্র সরু পথ। প্রান্তরে প্রবেশ করিবার তাহাই একমাত্র পন্থা। জেনারেল ডায়ার সেই সঙ্কীর্ণ গলিপথের মুখে তাঁহার সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। তারপর জনতাকে কিছুমাত্র সতর্ক না করিয়া তিনি যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন, পৃথিবীর নারকীয় ইতিহাসের পাতায় তাহা আজও অক্ষয় হইয়া আছে।

নৃশংস মেশিন-গানের ১৬০০ রাউণ্ড গুলিতে প্রায় সমগ্র জনসংঘ দেখিতে দেখিতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চারিশতাধিক নিহত ও সহস্রাধিক আহত ব্যক্তির দেহে রক্ত-রঞ্জিত প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গোলাগুলি নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জেনারেল ডায়ারের বাহিনী অবিশ্রান্ত ভাবে মেশিন-গান চালাইয়া গেল। *

---

* It is said that the General did not cease firing till ammunition in his possession was totally exhausted.

—*The Sentinel of the East.*

জেনারেল ডায়ারের সেই নৃশংসতা বর্ণনা করিতে হইলে জেনারেলের নিজের উক্তিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা সঙ্গত।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে হাণ্টার-কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল, সেই অধিবেশনে কমিটির জনৈক সদস্য জাষ্টিস্ র‍্যাঙ্কিনের প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল ডায়ার বলিয়াছিলেন, "আমাকে এক ভয়ঙ্কর কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইয়াছিল। আমি মনে করি ইহা খুবই মানবতার কাজ। আমি তখন মনে করিয়াছিলাম, আমি খুব ভাল ভাবে ও দৃঢ়ভাবেই গুলি চালাইব, আমাকে বা আর কাহাকেও যেন পুনরায় গুলি করিতে না হয়। আমার বিশ্বাস, গুলি না চালাইয়াও হয়ত জনতা ছত্রভঙ্গ করা যাইত; কিন্তু তাহা হইলে ঐ লোকগুলি আবার ফিরিয়া আসিত এবং আমাকে উপহাস করিত; আর তাহাতে আমি জনতার নিকট হাস্যাস্পদই হইতাম।" *

এই নৃশংস নির্ব্বিচার হত্যাকাণ্ডে আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ ঘৃণা ও রোষে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। হিন্দু বিচলিত হইল, মুসলমান বিচলিত হইল, কংগ্রেসও বিচলিত হইল।

কবি রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে তখন আর রাজনীতির সহিত

---

* "It was a horrible duty I had to perform. I think it was a merciful thing. I thought that I should shoot well and shoot strong, so that I or anybody else, should not have to shoot again. I think it is quite possible I could have dispersed the crowd without firing, but they would have come back again and laughed, and I should have made, what I consider, to be a fool of myself." —*The Sentinel of the East.*

সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তাঁহাকেও মর্ম্মাহত করিয়া ফেলিল। ইহার মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "স্যার" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন; কিন্তু যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহারই দেশবাসীর বুকে এমন নির্ম্মমভাবে জ্বলন্ত গুলি বর্ষণ করিতে পারে, তাহার প্রদত্ত সম্মান তাঁহার নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার বলিয়া মনে হইল। সুতরাং তিনি ১৯১৯ সালের ৩০শে মে তারিখে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে একখানি চিঠি লিখিয়া সেই উপাধি বর্জ্জন করিলেন।

জগতে যে কয়েকখানি চিঠি তাহাদের ভাষা ও ভাবের জন্য আজও স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছে, কবি রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি তাহাদের অন্যতম। এত বড় একটা পৈশাচিক ঘটনার প্রতিকারে কবি তাঁহার নিজের ও তাঁহার দেশবাসীদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া, অন্যান্য অনেক কথার সঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

> "আমি আমার দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করিতে পারি, তাহা হইতেছে কেবল এই পর্য্যন্ত যে, নিজের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া আমার দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া ইহার প্রতিবাদ করা।....এমন একটা সময় আসিয়াছে, যে সময় আমাদের সরকারী খেতাব বা উপাধিগুলি জাতীয় অবমাননার সংস্পর্শে আমাদের লজ্জাটাকে আরও বেশী সুপরিস্ফুট করিয়া তোলে। সুতরাং আমি এখন সরকারী সম্মানের সমস্ত চিহ্ন বিবর্জ্জিত হইয়া আমার দেশের সেই সব লোকের পাশে যাইয়া দাঁড়াইতে চাই, যাহারা

রবীন্দ্রনাথ (বয়স ২৯ বৎসর)
দক্ষিণে জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতা (বেলা)
বামে জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ

যুবক রবীন্দ্রনাথ (বয়স ২৭ বৎসর)

তাহাদের তথাকথিত নগণ্যতার জন্ম মানুষের অনুপযোগী অপমান সহ্য করিতে বাধ্য হয়।”...*

কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি স্বদেশী-যুগের অব্যবহিত পরেই রাজনীতির বন্ধুর ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া শান্তি-নিকেতনের তপোবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন, জাতীয় অবমাননায় তিনি যে এরূপ ভাবে সিংহ-বিক্রমে দণ্ডায়মান হইবেন, তাহা অনেকেই পূর্ব্বে ভাবিতে পারে নাই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, জাতীয় সঙ্কটকালে বা বিপন্ন মানবতার চরম মুহূর্ত্তে তিনি কখনও নিষ্ক্রিয় দর্শকের অভিনয় করেন নাই।

* "Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government of the Punjab for quelling some local disturbances, has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India.........The accounts of the insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab has trickled through the gagged silence, reaching every corner of India,......knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship of our Government,....... The very best that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised to a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous contrast of humiliation, and I for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings.

And these are the reasons which have painfully compelled me to ask your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of knighthood......"

"স্যার" উপাধি পরিত্যাগ করিবার অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের মমত্ব ও সম্মান-বোধ আরও একবার স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল।—

'পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য যাহারা দায়ী, নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি-বর্ষণ করিয়া যাহারা উৎকট পশুশক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যখন ভারত-গভর্ণমেণ্ট ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে একটি আইনের খসড়া (Indemnity Bill) আনয়ন করিলেন, এবং বিলাতের লর্ড-সভা যখন সেই নিষ্ঠুর ঘাতকদিগকে উচ্চ প্রশংসায় অভিনন্দিত করিয়া তাহাদিগকে বিপুল অর্থ প্রদানে পুরস্কৃত করিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন আর একবার তাঁহার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সেই সম্পর্কে তিনি দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ (C. F. Andrews) সাহেবকে লিখিয়াছিলেন—

> "জেনারেল ডায়ার সম্পর্কে পার্লামেণ্টের উভয় সভায় যে বিতর্ক হইয়া গেল, তাহার ফলে ভারতবর্ষের প্রতি এদেশের শাসকশ্রেণীর যে মনোভাব তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে এই কথাটাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদের বিরুদ্ধে ও-দেশের প্রতিনিধিগণ যত বীভৎস অত্যাচারই করুক না কেন, তাহাতে আমাদের শাসক জাতির অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র ঘৃণারও উদ্রেক করিতে পারে না।"*

* "The result of the Dyer debates in both the Houses of Parliament makes painfully evident the attitude of mind of the ruling classes of the country towards India. It shows that no outrage, however monstrous, committed against us by agents of their Goverment, can arouse feelings of indignation in the hearts of those from whom our Governors are chosen." —*The Sentinel of the East*

ইংরেজী ১৯৩১ সালে হিজলীতে নিরস্ত্র অসহায় রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যখন জেল-কর্ত্তৃপক্ষ গুলি চালাইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে যখন কয়েকজন নিহত ও আহত হইল, রবীন্দ্রনাথের হৃদয় তখন মানবতার জন্য আরও একবার ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিল।

এই নিষ্ঠুর গুলি-চালনার প্রতিবাদে গড়ের মাঠে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। বিপুল জন-মণ্ডলীর সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলিয়াছিলেন—

> "আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক-করতে চাই যে, বিদেশী রাজ যত পরাক্রমশালী হোক্‌না কেন, আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়,—ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়।
>
> প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন নাও হতে পারে; কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি?"

মানবতার আহ্বানে কবি রবীন্দ্রনাথ কখনও ভৌগোলিক সীমা-নির্দ্দেশে নিজেকে সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। মানবতার আহ্বানে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষেত্রেই তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন।

আবিসিনিয়ার শান্তিপ্রিয় অসামরিক নাগরিকগণ যখন ইটালীর ভূতপূর্ব্ব ডিকটেটর মুসোলিনীর নির্দ্দেশে অতি অসহায়ভাবে বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত মারাত্মক বোমার আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন

দিতেছিল, রবীন্দ্রনাথ তখন তীব্রভাবে মুসোলিনীর সেই কার্য্যকে নিন্দা করিয়াছিলেন।

স্পেনের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদিগকে যখন প্রচণ্ড পশুশক্তি দলিত নিষ্পেষিত করিয়া চণ্ডনীতির চরম দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রাণ তখনও মানবতার আহ্বানে আর একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তখন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহযোগে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্পেনের রিপাব্লিককে সাহায্য করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদিগের সঙ্গে যখন ইংরেজের যুদ্ধ চলিতেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র দংশনে যখন নিরীহ অধিবাসীরা আর্ত্তনাদ করিতেছিল, কবি রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁহার কাব্য-বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া বলিয়াছিলেন—

"শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ-রাগিণী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে।" *

জাপান যখন তাহার সাম্রাজ্যবাদের দুর্জ্জয় নেশায় উন্মত্ত হইয়া বিজয়-গর্ব্বে তাহার প্রতিবেশী চীনের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত হৃদয় তখন চীনের জন্য সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহার ফলে জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে

* নৈবেদ্য, ৬৪নং।

চিঠিপত্রের মারফৎ এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কবি নোগুচি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, উন্নত ধরণের এক নূতন 'এশিয়া' প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই জাপান তাহার অভিযান সুরু করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে অতি সামান্য একটু অংশই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

> "আপনি এমন এক এশিয়ার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছেন যাহা কেবল নরমুণ্ডের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমি এশিয়ার বাণীতে বিশ্বাস করি বটে কিন্তু নরহত্যায় বীভৎস কৃতিত্বের জন্য তৈমুরলঙের প্রাণে আনন্দ প্রদান করিতে পারে এরূপ কাজের সঙ্গে যাহা সমপর্য্যায়-ভুক্ত, আমি সেরূপ কোন বাণীর কথা কল্পনাও করিতে পারি নাই।" *

মোট কথা, ১৯০৭ সালের পরে প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস অভিযানের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আর কখনও যুদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু তথাপি সাম্রাজ্য-বাদের কোন দম্ভ বা কোন অত্যাচারই তিনি নীরবে মাথা পাতিয়া সহ্য করেন নাই। তাঁহার কাব্যেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি অনেক স্থলেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতার নিকট ভারতের জন্য যখনই তিনি কোন প্রার্থনা করিয়াছেন, তখনই তাঁহার বলিষ্ঠ

---

* "You are building your conception of an Asia which would be raised on a tower of skulls. I have, as you rightly point out, believed with message of Asia, but I never dreamt that this message would be identified with deeds which brought exaltation to the heart of Tamerlane, at his terrible efficiency in man-slaughter"

হৃদয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে দেখিতে পাই।—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস-শর্ব্বরী,
বসুধারে রাখে নাই খণ্ডে ক্ষুদ্র করি,
... ...
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।" (১)

তাঁহার বলিষ্ঠ হৃদয়, সাম্রাজ্যবাদ বা অপর কোন কিছুর নিকট নতি স্বীকার বা ভীতি স্বীকার করিতে কোন দিনই সম্মত হয় নাই; সুতরাং তাঁহার প্রার্থনায়ও অনেক স্থলে সেই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন কি, ক্ষমার নামে আত্ম-প্রবঞ্চনাকেও তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে ঘৃণা করিতেন।—

"...ক্ষমা যথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি ওঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে! ... ...
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।" (২)

ভীতি-বর্জ্জনের কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছভয়,—
লোকভয়, রাজ্যভয় মৃত্যুভয় আর!" (৩)

---

(১) নৈবেদ্য, ৭২নং। (২) নৈবেদ্য, ৭০নং। (৩) নৈবেদ্য, ৪৮নং।

বস্তুতঃ ভীতি-বর্জ্জন ও জাতীয় মর্য্যাদা-রক্ষা, ইহাই ছিল তাঁহার যাবতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র। জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ ঘোষণার সময় তিনি তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করেন নাই।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ যখন ব্যাধি-পীড়িত অবস্থায় তাঁহার রুগ্ন শয্যায় শুইয়া ছিলেন, সেই সময় মিস্ র‍্যাথ্‌বোন্ নাম্নী এক ইংরেজ মহিলা একখানি খোলা চিঠিতে কারারুদ্ধ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। বিশেষতঃ পণ্ডিতঃ নেহেরুকে তিনি যে ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই উদ্ধত ও অমার্জ্জনীয়।

মিস্ র‍্যাথ্‌বোন্ বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা ইংরেজের নিকট শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নত রাজনীতির জন্য কৃতজ্ঞ; সুতরাং বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ যখন স্বভাবতঃই পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময় তাহাদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা বা সত্যাগ্রহ-আন্দোলন করা নিতান্তই সভ্যতা-বিরোধী।*

* "One thing is plain. You (Pandit Nehru) and most of the leading men and women among your followers have some cause to love, or at least to be grateful to England, for you have drunk deeply at the wells of English thought; you owe much to western and especially to British teachers, men of science, sociologists; yes, and to British statesmen and politicians too, for it is over here that the great experiment of democratic institution and liberties has been chiefly hammered out. ... ...

Writing in August, 1940, when to all but ourselves the day of our defeat seemed near, Pandit Nehru declared, 'We are prepared to take risks and face dangers. We do not need the so-called protection of the British army and navy. We will shift for ourselves'. A rash boast indeed!"

মিস্ র‍্যাথ্‌বোনের মূল বক্তব্য বিষয় ইহা হইলেও, তাঁহার ভাষা ও দৃপ্ত ভঙ্গী কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট জাতীয় মর্য্যাদার অপমান বলিয়া মনে হইল। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ আহত সিংহের ন্যায় তাঁহার রুগ্ন শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং সেই উদ্ধত পত্রের সগর্জ্জনে প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন—

"কে এই মিস্ র‍্যাথ্‌বোন্, আমি তাহা জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ইংরেজদের মধ্যে যাঁহারা সাধারণ সাধু চরিত্রের লোক, তিনি তাঁহাদেরই একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন। (I take it she represents the mentality of the average "well intentioned" Britisher.)

তাঁহার চিঠি প্রধানতঃ পণ্ডিত জওহরলালকে উদ্দেশ্য করিয়াই লিখিত; এবং আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, সেই সাহসী স্বাধীনতার সৈনিক যদি মিস্ র‍্যাথ্‌বোনেরই স্বদেশীয় ভাইদের দ্বারা কারারুদ্ধ না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি ইহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতেন। তাঁহার বাধ্যতামূলক নির্ব্বাক্ অবস্থাই আমাকে আমার রুগ্নশয্যা হইতে এই জবাব দিতে বাধ্য করিয়াছে।...

তিনি আমাদিগকে অকৃতজ্ঞতার অপবাদ দিয়াছেন এই জন্য যে, 'ইংরেজের চিন্তাধারা আকণ্ঠ পান করিয়াও' আমাদের হতভাগ্য স্বদেশের জন্য এখনও কিছু চিন্তা ও ভাবনা আমাদের রহিয়া গিয়াছে!....

ইহা নিতান্তই উদ্ধত আত্মপ্রশংসা যে ইংরেজরা মনে করে যে, তাহারা আমাদিগকে 'শিক্ষা' না দিলে আমরা আজও অন্ধকারেই রহিয়া যাইতাম!...

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

পিতার মৃত্যুর পর মুণ্ডিত মস্তক
রবীন্দ্রনাথ

যদি মানিয়াও লই যে, ইংরেজের প্রদত্ত শিক্ষা আমাদের 'উন্নতির' (Enlightenment) সাহায্য করিয়াছে, তাহা হইলেও, এই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ইংরেজ শাসনের দুই শতাধিক বৎসরের মধ্যে সেই শিক্ষার গুণে ভারতের শতকরা একটি মাত্র লোক ইংরেজী লিখিতে পারে দেখা গিয়াছে। কিন্তু রুশিয়ায় সোভিয়েট শাসন প্রবর্ত্তন হইবার মাত্র ১৫ বৎসরের মধ্যে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শতকরা ৯৩টি শিশু শিক্ষিত হইয়াছে।....

আমি যখন দেখিতে পাই যে, ইংরেজের সমস্ত জাহাজ কেবল তাহাদের দেশে খাদ্য বহন করিয়া লইবার কাজেই ব্যস্ত রহিয়াছে এবং যখন মনে হয় যে, আমার দেশের লোককে আমি অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি, অথচ নিকটবর্ত্তী জেলা হইতে একগাড়ী খাদ্যও তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় না, তখন এই ইংরেজ তাহার স্বদেশে কিরূপ, তাহা তুলনা না করিয়া পারি না। সুতরাং খাদ্য দিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য না হইলেও অন্ততঃ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই কি আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব? আমি দেখিতে পাইতেছি, দেশের সর্ব্বত্র এখন দাঙ্গা চলিতেছে। আমাদেরই কোটি কোটি জীবন নষ্ট হইতেছে, আমাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে, নারীগণ লাঞ্ছিত হইতেছে, কিন্তু প্রতাপশালী ইংরেজের অস্ত্রবল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়! কেবল, আমরা আমাদের নিজেদের ঘর সামলাইতে পারি না বলিয়াই সমুদ্রের ওপার হইতে ব্রিটিশের তীব্র ভর্ৎসনা আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছে!....

ইংলণ্ডে আজ প্রত্যেকটি ইংরেজ শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহার বাড়ীঘর রক্ষার জন্য সশস্ত্র হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে লাঠিখেলা শিক্ষা পর্য্যন্ত আইনের বলে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের

সশস্ত্র প্রভুরা আমাদের লোকজনকে নিরস্ত্র ও নির্বীর্য্য করিয়া রাখিয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা যেন প্রভুদের অধীনে তাহাদের দয়ার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে।”—

মিস্ র্যাথ্‌বোন্‌কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি আজও জগতে এক ঐতিহাসিক দলিল হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ শাসনের যে কোন সমালোচক এই দলিলে প্রভূতরূপে উপকৃত হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মিস্ র্যাথ্‌বোন্ তাঁহার স্বজাতি-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতীয় সংস্কার ও শিক্ষা-দীক্ষার বিরুদ্ধে যে কদর্য্য ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, যে কলুষিত ভাষায় তিনি ভারতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ললাটে কলঙ্ককালিমা বিলেপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, অন্য কেহ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল কি না হইল, জানি না ; কিন্তু অন্য কেহ তাহার কোন প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে ব্যাধিগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথই তাহার জ্বলন্ত প্রতিবাদ করিলেন !

একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ কবি—বিশেষতঃ যিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে বহু পূর্ব্বেই সরিয়া গিয়াছিলেন—জাতীয় অপমানে তিনি তাঁহার রুগ্ন শয্যা হইতেও কঠোর কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, ইহা ভাবিলেও সমগ্র জাতির পক্ষে কৃতজ্ঞতায় তাঁহার পদতলে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে !

স্বদেশপ্রেম, মানবতা ও মর্য্যাদা-বোধ তাঁহার এতই ছিল মহান্ ও তীব্র !

নয়

'শান্তি-নিকেতন'

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে—স্বদেশী-আন্দোলনের পরক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম যেদিন রাজনীতির কলুষিত জটিল প্রান্তর হইতে নিঃশব্দে সরিয়া গেলেন, সেদিন অনেকেই তাঁহাকে 'ভীরু' বলিয়া অপবাদ দিতে ইতস্ততঃ করে নাই। সেদিন কেহ বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই যে, কেবল বাগাড়ম্বর হৈ-চৈ করিয়া যে দেশসেবা, তিনি তাহার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার দেশসেবা ছিল কবি-হৃদয়ের কল্পনার মতই সুদূরপ্রসারী ও চির-উচ্ছ্বাসময়।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব ভাবুক ও সাধক। ভৃত্য-রাজতন্ত্রের আমলে রবীন্দ্রনাথ যখন স্বাধীনতা-বর্জ্জিত শিশু, তখনও তাঁহার ভাবুক মন নীরবে কত খেলাই খেলিয়া যাইত! কল্পনা ও ভাবের সাধনায় তাঁহার শিশু-মন কত অনলস ঘণ্টাই অতিবাহিত করিয়াছে! তিনি বলিয়াছেন—

> "গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। ....এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য নিঃস্তব্ধ।"

কখনও বলিয়াছেন—

"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল। সেইজন্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল আড়াল হইতে দেখিতাম।"

কল্পনার সাধনায় তাঁহার ভাবুক মন তাঁহাকে পৃথিবীটা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া দেখিতে প্রলুব্ধ করিত।—

"তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটী, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি!"

শৈশবের কঠোর জীবনেও যিনি বন্দীর সঙ্কীর্ণতা ও দুঃখভোগকে সাধনারই অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন, সম্পূর্ণ জীবনটা সমগ্রভাবেই যে তাঁহার নিকট একটা বিরাট সাধনায় রূপান্তরিত হইয়া উঠিবে, একথা সেদিন—সেই ১৯০৭ সালে কেহই বুঝিবার চেষ্টা করে নাই!

তাহা যদি কেহ করিত, তাহা হইলে সেদিন তাঁহাকে 'ভীরু' আখ্যা না দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিত কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যবশতঃ তিনি অন্তরালে সরিয়া যাইতেছেন! ভীরু যে, সে কখনও জাতীয় অপমানে উদ্বেল হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিতে পারে না, বিপন্ন মানবতার আহ্বানে মর্ম্মাহত হয় না; হইলেও ভীরুতা তাহার অন্তরের উৎসমুখে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া রাখে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমও ছিল সাধনার অঙ্গীভূত। তিনি যখন দেখিলেন স্বদেশসেবার নামে গঠনমূলক কাজ ও শক্তিসঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে

ধ্বংসাত্মক কাজ ও শক্তির অপব্যবহারে শান্ত-সবুজ প্রান্তরও রক্ত-রঙিন হইয়া উঠিতেছে, তিনি তখন স্বয়ং তাহা হইতে নিঃশব্দে দূরে সরিয়া গেলেন ; কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা-বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিয়া অপমানিত করিলেন না !

রাজনৈতিক ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ হইতে তিনি গঠনমূলক অপর কিছু সৃষ্টির আশায় 'শান্তি-নিকেতনে' চলিয়া গেলেন।

কলিকাতা হইতে প্রায় একশত মাইল দূরবর্ত্তী বোলপুর ষ্টেশনের নিকটে ইহা অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের পিতা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া এইস্থানে আসিয়া ইহার নির্জ্জন শান্ত পরিবেশে মুগ্ধ হইয়া এইখানে এক বিশাল ভূখণ্ড কিনিয়া ফেলেন এবং তাহার নাম রাখেন 'শান্তি-নিকেতন' ; তারপর একটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে এইখানে আসিয়া বসবাস করিতেন এবং ঈশ্বর-আরাধনায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে এইখানে কয়েকবার বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনিও ইহার পরিবেশে মুগ্ধ হইয়া যান। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি জমিদারীর কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া এইখানে একটি 'বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

মহর্ষি সানন্দে পুত্রের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন, সুতরাং দেখিতে দেখিতে কয়েকটি মাত্র শিক্ষার্থী লইয়া শান্তি-নিকেতনে এক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিছুকাল অতি স্তিমিত ভাবেই ইহার জীবন-দীপ প্রজ্বলিত রহিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ তখনও সর্ব্বতোভাবে ইহাতে মনোনিবেশ

করিতে পারেন নাই। তখন ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এমন অবস্থাও হইয়াছিল যে, অভাবে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের পুরীর বাড়ী বিক্রয় করিতে হইয়াছিল; এমন কি, একবার পত্নী মৃণালিনী দেবীর অলঙ্কারও বিক্রয় করার আবশ্যক হইল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে পত্নী স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় রক্ষাকল্পে তাঁহার দেহাভরণ পর্য্যন্ত সানন্দে উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, মাত্র সামান্য কিছুকাল পরেই—রবীন্দ্রনাথের সেই সাধ্বী পত্নী মৃণালিনী দেবী পতি, পুত্র ও কন্যা রাখিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

পত্নীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন না, সাধকের ন্যায় স্তব্ধ-বিস্ময়ে গম্ভীরভাবে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া, সমগ্র বিশ্ব-মানবতার দিকে আপনাকে উন্মুখ করিয়া দিলেন।

তিনি কহিলেন—

"যে জন আজিকে ছেড়ে চলে গেল খুলি দ্বার
সেই বলে গেল ডাকি,
মোছো আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।
সেই বলে গেল, গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি,
নবগৃহ মাঝে বহি এনো তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকা গাছি।"

ইহার পর—১৯০৫ সালে—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও একদিন চিরদিনের

জন্য সংসার হইতে বিদায় লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন—রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর স্পর্শ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন।

পত্নী ও পিতার অভাবে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে যে সুগভীর শূন্য রন্ধ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, সাধক রবীন্দ্রনাথ তাহা বিশ্ব-মানবতার প্রেমে পরিপূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আর সম্ভবতঃ সেই কারণেই স্বদেশী আন্দোলনের তুফানে নিজের সত্বাকে অত নিঃস্ব ভাবে বিলীন করিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল; কিন্তু পরে যখন দেখিলেন যে, তুফানে বানচাল হইয়া বিপর্য্যস্ত হইবার আশঙ্কাই বেশী, আর তাহাতে বিশ্ব-মানবতার নিকট হইতে দূরে সরিয়া তিনি ক্রমশঃ নিঃস্ব সঙ্কীর্ণতা ও হিংসা-বিষের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন,—তখনই তিনি তাঁহার গতি সংযত করিলেন এবং স্নেহ প্রেম ও মানবতার আবাস এক বিদ্যালয় সৃষ্টির অভিপ্রায়ে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে শান্তি-নিকেতনের কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার শান্তি-নিকেতনের সেই আশ্রম-বিদ্যালয়ই আজ 'বিশ্ব-ভারতী' নামে এক ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকামাত্রই অতি আগ্রহের সহিত তাহার পূর্ণ বিবরণ জানিতে চাহিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সে কৌতূহল হয়ত সামান্য পরিমাণেও চরিতার্থ করা সম্ভব হইত; কারণ, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের রচয়িতা নিজেও সেই আশ্রম-বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র।

কিন্তু এই পুস্তকের পরিসর অল্প, আমাদের আলোচ্য বিষয়ও

'রবীন্দ্রনাথ' ; সুতরাং সেই প্রাচীন কালের প্রাক্তন বিদ্যালয়ের পরিপূর্ণ বিবরণ দেওয়া এস্থলে সম্ভব নহে। সংক্ষেপে গুটি-কয়েক কথা মাত্র বলা যাইতে পারে।

আশ্রম-বিদ্যালয়ের কাজে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় যেন যাদুমন্ত্রে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল! আশ্রমবাসী ছাত্র-সংখ্যা তখনও অতি নগণ্য ছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন জেলার ছাত্রদের সুশৃঙ্খল কাজকর্ম্ম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা লক্ষ্য করিলে প্রাচীন ভারতের কোন্ এক বেদ-বিদ্যালয় ও আধুনিক জগতের 'স্যাণ্ডহার্ষ্ট' (Sandhurst) সামরিক বিদ্যালয়ের সমন্বয় বলিয়াই মনে হইত।

প্রভাতে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাতঃস্নান, সারিবদ্ধভাবে ভূমিতলে আসনে উপবেশন করিয়া শালপাতায় আহার গ্রহণ,—ঘরে বারান্দায় গাছের নীচে বা ভ্রমণকালে পাঠ-গ্রহণ, খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদ ও ব্যায়াম-চর্চ্চা ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজই ছাত্র-ক্যাপ্টেনের আদেশে তাঁহার 'বেল্' (Bell) বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে সম্পন্ন করিতে হইত, তাহা না দেখিলে পূর্ব্বে কখনও কল্পনা করাও যাইত না যে, এই পঙ্গু ও অলস বাঙ্গালীর মধ্যে এমন ঐন্দ্রজালিক 'ডিসিপ্লিন্' (Discipline) কেমন করিয়া সম্ভব হইল!

কবি-হৃদয়ের অন্তরালে যে এরূপ কঠোর 'ডিসিপ্লিনের' উৎস লুক্কায়িত ছিল, ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল? প্রাচীন ভারতের অনাড়ম্বর যুগে শিক্ষার্থীদিগকে গুরুগৃহে যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

চিত্রাঙ্কনরত কবি রবীন্দ্রনাথ

করিতে হইত, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সেই কাঠিন্যের শিক্ষাদানেই পেলব বাঙ্গালীর দেহে ও মনে লৌহবর্ম্ম আঁটিয়া দিয়াছিলেন।

ধনি-দরিদ্র, প্রত্যেকটি ছাত্রকে একই ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে। কোন ছাত্রের দেহে উলের সোয়েটার, অপরের দেহে সূতী পাঞ্জাবী—এ পার্থক্য তদানীন্তন আশ্রমবাসীদের একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। শীত-গ্রীষ্ম, সর্ব্বকালে নগ্ন পায়ে পরিভ্রমণ, মালকোচা দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় 'মিলিটারী' পোষাকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যাতায়াত, আদেশ পালনে আধ মিনিট দেরী হইলেও রাত্রিকালে প্রকাশ্যভাবে তাহার বিচার—এসব কাঠিন্যকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্নেহাতুর দরদী হৃদয়ের মধুর রসে যে ভাবে অভিষিক্ত করিয়া সেই তরুণদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, সে জিনিষ জীবনে আর কোথাও সম্ভবপর বলিয়াও শুনিতে পাই নাই। বিশ্ববিখ্যাত র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসুর পুত্র অরবিন্দ বসু, রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অরুণ সেন, কলিকাতা বড়াল পরিবারের অমিয় বড়াল, স্বর্গত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষ মজুমদার, খুলনা-বাগেরহাটের জমিদার-নন্দন দেবেন্দ্র বিশ্বাস ও রাজেন্দ্র বিশ্বাস, কিংবা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের নগণ্য ও দীনতম লেখকের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্যের কল্পনাও শান্তি-নিকেতনের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে তৎকালে অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইত।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তৎকালে ছাত্রদিগকে অধ্যাপনার কাজে অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার নিকট ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সঙ্গীত চর্চ্চা

করিবার সৌভাগ্য সে যুগের বহু ছাত্রেরই হইয়াছিল। এমন কি, ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহার গৃহে যাইয়া ঘরে-বাহিরে উৎপাতও নিতান্ত কম করে নাই! কিন্তু বিনিময়ে মীরা দিদি তাহাদিগকে কিছুক্ষণ পড়াইয়া, অবশেষে স্বহস্তে নানারকম মিষ্টান্ন পরিবেষণে তৃপ্ত করিয়া বিদায় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিমুখে স্বীয় কন্যার খেয়াল ও শিশুদের চাঞ্চল্য উপভোগ করিতেন।

আজ মনে পড়ে, মীরা দিদির মিষ্টান্ন-পরিবেষণের সুযোগ যাহারা লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে এই নগণ্য গ্রন্থকার ব্যতীত ত্রিপুরারাজ্যের তদানীন্তন দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র ব্রজেন্দ্র* ও জিতেন্দ্রর নামও করা যাইতে পারে।

আশ্রমের পরিচালক শিক্ষকদিগকে 'পিতার মত' বলিলে ভুল বলা হইবে; কারণ, পিতা কি কখনও সন্তানের জন্য অত স্নেহ ও ভালবাসা দেখাইতে পারেন? 'মায়ের মত' বলিলে সম্ভবতঃ তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার কথঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হয় মাত্র। কলেরা, বসন্ত বা খোসপাঁচড়া প্রভৃতি সংক্রামক ও ঘৃণ্য ব্যাধিগ্রস্ত শিক্ষার্থীও শিক্ষকদের ঘৃণা বা বিরক্তি উৎপাদন করে নাই। তাঁহারা সস্নেহ হস্তে পীড়িতের জ্বালা-যন্ত্রণার উপশমে সহায়তা করিয়াছেন।

অতি গর্ব্ব করিয়াই বলা যায় যে, আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কবি-জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, জগদানন্দ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ আইচ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, কানাইলাল গুপ্ত ও অক্ষয় বাবু

* বর্ত্তমানে শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

প্রভৃতির সস্নেহ যত্ন তদানীন্তন আশ্রমবাসীদের হৃদয়ে আজিও অক্ষয় দাগ কাটিয়া রহিয়াছে।

তৎকালীন বিবরণ ও ইতিহাস বর্ণনা করিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে, এবং তৎকালীন ছাত্র ও শিক্ষকদিগের অনেককেই এই পুস্তকের অঙ্গীভূত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে হয়। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাহাতে ক্ষান্ত হইতে হইল। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের 'মিলিটারী ডিসিপ্লিনের' সমন্বয়ে, বোলপুরের সেই ঊষর কঙ্করময় ক্ষেত্রে গৌরবের স্বপ্নে-গড়া এক সোনালী ফসলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন !

অতীতে যাহা কেবল ঐটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্ত্তী কালে সেই আদর্শকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এক মিলন-ক্ষেত্র 'বিশ্ব-ভারতী' গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ইহা আজ কেবল ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয় না। সংস্কৃত, বৌদ্ধ, চৈনিক, তিব্বতীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য আজ বিশ্ব-ভারতী জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

সমাজের যাহা দুর্নীতি-স্বরূপ—জাতিভেদ ও ধর্ম্মান্ধ গোড়ামি,—তাহা বিশ্ব-ভারতীতে একেবারেই প্রবেশ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ হইতে কত বিভিন্ন মনীষী মাঝে-মাঝে এখানে

সমবেত হইয়া জগতের ভাব ও কৃষ্টি-সমন্বয়ে সাহায্য করিয়া ইহাকে এক মিলন-তীর্থে পরিণত করিয়াছে।

মোট কথা, কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক সোনার স্বপ্ন—কল্পনা-জগতের এক অপরূপ চিত্র—তাঁহার সৃজনী ক্ষমতায় বাস্তবে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আশৈশব বিশ্ব-জগতের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে আর বাংলার দুলাল-দুলালীর সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক পাতাইবার জন্য নীরব সাধনা করিতেছিলেন,—আজ জগৎ জানে, তাঁহার সে সাধনা সফল হইয়াছে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বীয় পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি পাঁচটি মাত্র শিক্ষার্থী লইয়া যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই ভিত্তির উপর—তাহারই বক্ষের উপর আজ 'বিশ্ব-ভারতীর' বিকাশ।

ঐ পাঁচটি মাত্র শিক্ষার্থী সেদিনও তাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া জানিত। আজও বিশ্ব-ভারতীর পরিবেশে কিংবা পৃথিবীর যে কোন পরিবেশে—সর্ব্বত্রই তিনি 'গুরুদেব' নামে বিখ্যাত হইয়া আছেন।

সাহিত্যে, কর্ম্মে, আদর্শে—নিজের জীবনে তিলে তিলে তিনি বাংলার সকলকে, সমগ্র বিশ্ববাসীকে—কত শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন! তাই তিনি গুরুদেব। ভারতকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীকে—তিনি ইষ্টমন্ত্র দিয়া গিয়াছেন; সে মন্ত্র—স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক দুর্নীতি বর্জ্জনের মন্ত্র, নিজেকে নিঃস্ব করিয়া বিশ্বের মাঝে বিলাইয়া দিবার মন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাই আজও আমাদের 'গুরুদেব'।

দশ

অস্তাচলে

জগতে গুরুদেবের স্থান গ্রহণ করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তদনুরূপ নিজের শিক্ষার আবশ্যক হয়; কিন্তু সে শিক্ষা অর্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা—বিদেশ-ভ্রমণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কর্ম্ম-বহুল সুদীর্ঘ জীবনে পৃথিবীর অগণিত দেশ ভ্রমণ করিয়া, বিভিন্ন দেশবাসীর রীতি-নীতি ও ত্রুটী-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহাই তাঁহার কল্পনা ও জ্ঞান-ভাণ্ডারকে এত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী, সুইজার্ল্যাণ্ড, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ-আমেরিকা, জাভা, বালী, পারস্য ইত্যাদি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্রই তিনি প্রচুর সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

বিদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি বিদেশ হইতে যে জ্ঞানৈশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার সাহিত্য, কাব্য ও গীতি-ভাণ্ডার অনেক স্থলেই তাহাতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি গ্রন্থে কেবল ভ্রমণ-বিষয়ক বর্ণনার সঙ্গে যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে,

তাহাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রত্ন-ভাণ্ডারের জলুষ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া, আরও অনেক কবিতায় তাঁহার ভ্রমণ-লব্ধ রত্নরাজির ছিঁটেফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের পর শান্তি-নিকেতনের উদার প্রকৃতি-কোলে উন্মুক্ত গগন-তলে বসিয়া কল্পনা-বিলাসী রবীন্দ্রনাথ যে গীতি-মাল্য ও কবিতার ডালি রচনা করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বের দরবারে তাহাই তাঁহাকে স্বর্ণ-সিংহাসনের অধিকারী করিয়াছে। আর তাহারই ফলে ১৯১১ সালে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করিয়া তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যেন জানিতেন যে, একদিন না একদিন তাঁহার সাধনা সফল হইবেই—জগতের বিজয়মাল্য তাঁহারই গলদেশে আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে! তাহা না হইলে কি তিনি কখনও গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারিতেন—

"তোমরা কেউ পারবে না গো
 পারবে না ফুল ফোটাতে।
যতই বল যতই কর
যতই তারে তুলে ধর
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
 আঘাত কর বোঁটাতে।
তোমরা কেউ পারবে না গো
 পারবে না ফুল ফোটাতে।"

রবীন্দ্রনাথের এই গর্ব্বপ্রকাশ-সম্পর্কে পূজনীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার 'কাব্য-পরিক্রমা' গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন—

> "তাঁহাদের কাব্য-রচনা ঐ বোঁটার আঘাত করা মাত্র, আলঙ্কারিক প্রথাকে ভাঙিবার প্রয়াস মাত্র—কিন্তু ফুল ফুটিয়াছে কোথায়? সেই ফুল ফুটিয়াছে 'গীতাঞ্জলি'তে। সেইজন্ত তাহার বাহ্ সৌষ্ঠবেই ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের মন সর্ব্বপ্রথম ভুলিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে এত বই লিখিয়া গিয়াছেন যে, কেবল তাহাতেই এক বিরাট লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিতে পারে। ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গীতি-নাট্য, সমালোচনা, রাজনৈতিক ও বিবিধ প্রবন্ধ, গান, ভ্রমণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল, তাহা মুহূর্ত্তকাল তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা দেখিলেই উপলব্ধি হইবে।

ইংরেজী ১৮৭৮ সাল হইতে ১৯৪১ সাল—অর্থাৎ মৃত্যুর বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভায় বাংলা, তথা সমগ্র ভারতকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। সেই দীপ্ত আলোকের দুই-একটি মাত্র রশ্মি লইয়া ভারতবর্ষ ও সমগ্র পৃথিবী তাহাদের পথানুসন্ধান করিতেছে।

বাংলার এই দুর্দ্দিনে, ভারতের এই মহা দুঃসময়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ন্যায় একজন দূরদর্শী বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিকের নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তাঁহার অভাব সমগ্র দেশ আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে বাধ্য। ইংরেজী ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার গুরুদেব, সমগ্র ভারতের গুরুদেব, চিরদিনের জন্য নীরব হইয়াছেন।

মূত্রগ্রন্থির বিকলতায় তিনি শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চিকিৎসকদিগের উপদেশ অনুসারে ৩০শে জুলাই তারিখে তাঁহার দেহে

অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের ফলে সকলের মনেই আশার সঞ্চার হইয়াছিল; সকলেই ভাবিলেন, কবি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া যাইবেন; কিন্তু সহসা ১লা আগষ্ট হইতে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ অবনত হইয়া পড়ে। অবশেষে ৭ই আগষ্ট তারিখে, বৃহস্পতিবার, বেলা ১২টা ১৩ মিনিটের সময় (বাংলা ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল) কবির কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গেল।

কণ্ঠ তাঁহার নীরব বটে, কিন্তু তাঁহার আদর্শ, তাঁহার বাণী আজও আমাদের সম্মুখে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত হানাহানি হিংসা-দ্বেষের ঊর্দ্ধে ছিল সেই আদর্শ, আর সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম্মান্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অভিযান ছিল তাঁহার বাণী। সে আদর্শ ও সে বাণী আমাদিগকে যথার্থ পথে পরিচালিত করিবে—দেশ আবার উন্নত হইয়া উঠিবে, গুরুদেবের এই অভিপ্রায় কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

তবু মৃত্যুকালে কি যেন উদ্বেগ, কি যেন এক আশঙ্কা তাঁহাকে খুব বেশী ব্যথা দিতেছিল! তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচারের দিন সূর্য্যাস্তকালে, সম্ভবতঃ নিজের অস্তকাল সমীপবর্ত্তী বুঝিয়া তিনি মুখে মুখে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও কবির তৎকালীন উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার জন্য তাহা এইখানে উদ্ধৃত হইল—

"তোমার সৃষ্টির পথ, রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা-জালে, হে ছলনাময়ী,

ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রথম মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ
পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে
মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
তার তরে রাখোনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চির স্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাস সে যে
করে তারে চির-সমুজ্জ্বল
বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।”

কবিতার উদ্বেগ ও সান্ত্বনা, কিসের জন্য তাহা জানি না। সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বর্ত্তমান অবস্থার কোন আভাষ পাইয়াছিলেন কিনা, তাই বা কে জানে?—হয়ত অসম্ভব নহে। কারণ, বাংলার সাহিত্য, এবং বাংলার—তথা সমগ্র ভারতের রাজনীতি—আজও দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া এক তিলও নূতন করিয়া গড়িতে পারে নাই। সাহিত্যের মর্ম্মকথা, রাজনীতির ধর্ম্ম,—সর্ববত্রই গুরুদেবের দান ও ইষ্টমন্ত্র যেন রক্ষাকবচের মত সব-কিছু আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে!

সুদূর অতীতে, বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্র যখন শোণিত-পঙ্কিল, বাংলার আকাশ-বাতাস যখন হিংসার বিষে জর্জ্জরিত, তখন যিনি অহিংস পন্থার প্রয়োজনীয়তা ও বিশ্বপ্রেমের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া গিয়াছিলেন,—সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতি-ধর্ম্ম-বৈষম্যের পূতিগন্ধ যাঁহাকে সেই সুদূর অতীতেই ব্যথা-বেদনায় পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল,—প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেই যিনি ভাবীকালের সূচনা করিয়াছিলেন,—বাংলার প্রত্যেকটি জনপ্রাণী, ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসী তাঁহার কাছে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। কারণ, তাঁহারই দেওয়া ইষ্টমন্ত্র আজও সকলের জপমন্ত্র হইয়া আছে—তিনি সকলেরই **'গুরুদেব'**।

মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য যথেষ্ট ছিল সন্দেহ নাই। মহাত্মার আপোষমূলক মনোভাব রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই অনুমোদন করেন নাই।

তিনি বিশ্বাস করিতেন, অসহযোগিতা আন্দোলন শাসকবর্গের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই নহে; কিন্তু কোন দেশই বা কোন লোকই কখনই ভিক্ষা করিয়া স্বাধীনতা পাইতে পারে না।*

কেহ কেহ হয়তো যুক্তি দেখাইবেন, গুরুদেবের এই আশঙ্কা বর্ত্তমানে একেবারেই অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ, মহাত্মা-গান্ধীর প্রবর্ত্তিত পন্থায়ই তো আমাদের স্বাধীনতা-অর্জ্জন হইল! বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধেই তো ইংরেজ আজ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইয়াছে!

ইহার বিরুদ্ধে আমি বেশী কিছু বলিতে চাহি না। যাঁহারা ইহাকে স্বাধীনতা বলিতে চাহেন, তাঁহারা এই নবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে নৃত্য করিতে থাকুন, বাধা দিব না; কিন্তু আজও যেখানে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি, হাজার হাজার নারীর মর্য্যাদা ও লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন কেবল দুর্ব্বৃত্তের সদাশয়তার উপরেই নির্ভর করিতেছে, ভাই যেখানে ভাইকে ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে—নিরাপত্তা ও অন্নবস্ত্র যেখানে একেবারেই অলীক বলিয়া মনে হয়, সে দেশের ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতাকে বলিব 'স্বাধীনতা'? কাজেই আজও বলিব, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস একেবারেই মিথ্যা নহে, আর এই তথাকথিত স্বাধীনতা ইংরেজের কূট রাজনীতি ও আমাদের দুর্ব্বলতা মাত্র—প্রকৃত স্বাধীনতা নহে।

---

* "Non-cooperation movement, according to him, was a form of begging from the rulers. And, by begging, he says, no country, not even an individual has ever attained freedom."

—*The Sentinel of the East.*

ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে 'নরমপন্থী' (Moderates) ও 'গরমপন্থী' (Extremists) দুইটি শক্তিশালী দলের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া তিনি দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবকে বড় দুঃখ করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি কেবল এই ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন যে, নিজেদের ত্রুটী-বিচ্যুতি ও বিবাদের কারণ সংশোধন করিয়া লওয়াই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। *

মহাত্মা গান্ধী যখন লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন তাহাও অনুমোদন করেন নাই। তারপর মহাত্মার ইঙ্গিতে সুভাষচন্দ্র বসুকে যখন কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করা হইল, রবীন্দ্রনাথ তখন তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এত পার্থক্য ও মতানৈক্য সত্ত্বেও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে খুবই সৌহার্দ্দ্য বর্ত্তমান ছিল। মহাত্মাজী তাঁহাকে 'গুরুদেব' সম্বোধন করিতেন, আর গুরুদেবও মহাত্মার সম্পর্কে বলিতেন—

> "গান্ধীজীর সঙ্গে আমি অনেক বিষয়েই একমত নহি। তবু আমি এই লোকটিকে খুব বেশী প্রশংসা করি ও সম্মান করি। কেবল ভারতবর্ষেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নহেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র জগতের মধ্যেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

---

* "Let us forget the Punjab affairs but never forget that we shall go on deserving such humiliation over and over again until we set our house in order. Do not mind the waves of the sea but mind the leaks in your vessel.

Politics in our country is extremely pretty. It has a pair of legs, one of which has shrunk and shrivelled and become paralytic and therefore feebly awaits for the other one to drag it on. There is no harmony between the two, and our politics, in its hoppings and totterings and falls, is comic and undignified."

মহাত্মা গান্ধীও তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শান্তি-নিকেতনে আসিয়াও তিনি তাঁহার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন। শান্তি-নিকেতন-সম্পর্কে তাঁহার এত উচ্চ ধারণা ছিল যে, জাপানী সমাজনৈতিক কর্ম্মী কাগওয়া (Kagwa) যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, গান্ধীজী তখন তাঁহাকে শান্তি-নিকেতন দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—"শান্তি-নিকেতনই ভারতবর্ষ।"*

পণ্ডিত জওহরলালও একবার বলিয়াছিলেন—

'যে কখনও শান্তি-নিকেতনে যায় নাই, সে ভারতবর্ষই দেখে নাই।' §

গুরুদেবের তিরোধানে মহাত্মা গান্ধী মর্ম্মাহত হইয়া যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অতি সংক্ষেপে গুটি-কয়েক কথায় শোকাভিভূত জাতিকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—

"গুরুদেবের আত্মা অমর। মৃত্যু হইলেও তিনি বাঁচিয়া আছেন।" (a)

জগতের প্রসিদ্ধ মনীষী মিঃ বার্ণার্ডশ' বলিয়াছেন যে, তাঁহার চিত্র বিলাতের সাধারণ পাঠাগারে ঝুলাইয়া রাখা উচিত। (b)

সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা এবং সমগ্র ভারতের প্রাণের পূজা লইয়া রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ জ্যোতিঃ ও পূর্ণ মহিমার মধ্যে স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

* "Santiniketan is India."

§ "He who has not visited Santiniketan, has not seen India."

(a) "Gurudev's soul is immortal, and he lives though dead."

(b) "Sir William Rothenstein's portrait of Mr. Tagore should be hung in one of the British public libraries."

কেহ বলিয়াছেন, তিনি কবি ; কেহ বলিয়াছেন, তিনি দার্শনিক ; কেহ বলিয়াছেন, তিনি গুরুদেব। কে যে তিনি, কী যে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ও সংজ্ঞা, অনাগত ভবিষ্যৎকালের মনীষিবৃন্দ যুগ-যুগ ধরিয়া তাহারই গবেষণা করিবে।

আমরা ফুলের সঙ্গে তাঁহাকে কৌতুক করিতে দেখিয়াছি ; শিশুর সঙ্গে তাঁহাকে খেলা করিতে দেখিয়াছি ; আবার যুবক ও বৃদ্ধের নানা সমস্যায়ও তাঁহাকে মন খুলিয়া আলাপ করিতে শুনিয়াছি।—কাজেই কেমন করিয়া বুঝিব কে তিনি, আর কি বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিব ?

চিন্তাশীল ও মনীষী পাঠক-পাঠিকাদিগের হাতে সে বিচারের ভার সমর্পণ করিয়া, গুরুদেবের পদে প্রণতি জানাইয়া, এই নগণ্য গ্রন্থকার আজ বিদায় লইতেছে।